শুব্বানের পাঁচদফা
আমাদের পথচলা

তানযীল আহমাদ

শুব্বানের পাঁচদফা

আমাদের পথচলা

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-মাদানী

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক

তানযীল আহমাদ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

শুব্বানের পাঁচদফা আমাদের পথচলা

তানযীল আহমাদ
প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক
tanzilahmad.bd96@gmail.com

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
রবিউল ইসলাম

অক্ষর বিন্যাস
নূর ইসলাম (শিপলু)

মুদ্রণ
মুদ্রণ: মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস,
বাদামতলী, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
জমাদিউস সানী ১৪৩৯ হি.
মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী

অঙ্গসজ্জা :
নুহা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং
প্রোঃ মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ
মোবাইল: 01738-419-619, ই-মেইল: nuhacomputer15@gmail.com

প্রকাশনায়
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
www.shubbanbd.org
info.shubbanbd@gmail.com

নির্ধারিত মূল্য : ৩৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৪
২.	ভূমিকা	৫
৩.	শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচি	৭
৪.	প্রথম দফা: ইসলাহুল আক্বীদাহ্ বা আক্বীদাহ্ সংশোধন	৭
৪.ক	'আক্বীদাহ্ সংশোধন কেন?	৮
৪.খ	حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ - কী?	৯
৪.গ	كَلِمَةَ التَّقْوٰى - কী?	১০
৪.ঘ	'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস সংশোধনের গুরুত্ব	১১
৪.ঙ	তাওহীদের দাবি	১৬
৪.চ	আকীদাহ্ সংশোধনের দ্বিতীয় দিক: রিসালাতে বিশ্বাস	১৮
৪.ছ	রিসালাতের দাবিসমূহ	১৮
৫.	দ্বিতীয় দফা: আদ দা'ওয়াহ্ ওয়াত্ তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার	২৪
৫.ক	দা'ওয়াতের মূলনীতি (Principles of Da'wah)	২৭
৫.খ	দা'ঈর গুণাবলি (Characteristics of Dayee)	২৯
৬.	তৃতীয় দফা: আত তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	৪০
৬.ক	'সংগঠন' কাকে বলে?	৪১
৬.খ	'ইসলামী সংগঠন'-এর সংজ্ঞা	৪১
৬.গ	ব্যবস্থাপনা কী?	৪১
৬.ঘ	প্রচলিত ইসলামী সংগঠন ও একটি বিশ্লেষণ	৪৩
৬.ঙ	আদর্শ সংগঠনের রূপরেখা	৪৬
৬.চ	সংগঠনের মৌলিক উপাদান	৪৭
৬.ছ	নেতা ও নেতৃত্ব	৪৮
৬.জ	কর্মী ও আনুগত্য	৫৩
৬.ঝ	কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি	৫৭
৬.ঞ	পরামর্শ	৫৮
৭.	চতুর্থ দফা: আত্ তাদ্‌রীব ওয়াত তারবিয়্যাহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ	৫৯
৮.	পঞ্চম দফা: ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার	৬৫
৯.	ইতিকথা	৭২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد.

প্রশংসার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য। যাঁর বিশেষ তাওফীক ছাড়া "শুব্বানের পাঁচদফা আমাদের পথচলা" কখনোই আলোর মুখ দেখতো না। সালাত ও সালাম বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি, যার অনুসরণেই রয়েছে ইহ-পরকালীন মুক্তি ও চির শান্তি।

শুব্বানের পাঁচদফার ব্যাখ্যা লেখার জন্য সর্বাগ্রে যিনি আমাকে পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তায শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ নূরুল আবসার। যার হাতে আমার সংগঠনের হাতেখড়ি। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্মানিত নির্বাহী সম্পাদক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন এবং জমঈয়তের ফাতওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীমকে, যাঁরা প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও বইটির আদ্যপান্ত দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আমি এই পথের নতুন পথিক। হোঁচট খাওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু, আমার মশালে পর্যাপ্ত আলো ছিল না। কতই না ভাল হত, যদি পরিচিতজন এই নতুন পথিককে রসদ ও সুপরামর্শ দিতেন।

প্রাসঙ্গিক অল্পবিস্তর বই-পুস্তক অধ্যয়নপূর্বক হৃদয়ের একান্ত গভীর থেকে আমি এর শব্দ চয়ন ও বাক্যবিন্যাস করেছি। সুতরাং তা যদি আমার শুব্বান ভাইদের অন্তরে গেঁথে যায়, তাদের হতাশার ঘোর কেটে যায় এবং ঈমানী চেতনা ধারণ করে সাহসিকতার সাথে সম্মুখপানে চলার দৃপ্ত শপথ তারা গ্রহণ করে তবেই এই অকিঞ্চনের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত -

তানযীল আহমাদ

প্রশিক্ষণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. وبعد...

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করত জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর দেয়া নির্দেশনা মেনে জীবন পরিচালনা করাই মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব-কর্তব্য বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন ।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং সংঘবদ্ধভাবে ইসলামী বিধান পরিপালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেন -

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ الـخ

"এবং তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

সংঘবদ্ধতার নির্দেশ দিয়ে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন:

آمركم بخمس : بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। সংঘবদ্ধতা, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ।[১]

উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন:

"لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة"

জামা'আত (সংঘবদ্ধতা) ছাড়া ইসলাম শক্তিহীন এবং নেতৃত্ব ছাড়া জামা'আত অস্তিত্বহীন আর আনুগত্য (অনুগত কর্মী) ছাড়া নেতৃত্ব অসহায়।[২]

---

১. মুসনাদ আহমাদ, জামি তিরমিযী, ২৮৬৩।

আর এ সংঘবদ্ধতার অপর নামই সংগঠন। সংগঠন মানুষকে শৃঙ্খলা শেখায়। সংগঠন মানুষকে পরিশীলিত জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। সংগঠন মানুষকে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্য করে। যে সংগঠনের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন- তা সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে শান্তিময় করে তোলে। সংগঠন কল্যাণের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। মানুষকে অসৎ পথে চলা থেকে প্রতিহত করে। অন্যদিকে, একটি সংগঠন সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কার-বিপ্লব ও পরিবর্তনের হাতিয়ার। সাংগঠনিক স্বরূপ ছাড়া ইসলামের শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে না। সংগঠন ছাড়া ইসলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সংগঠন ছাড়া ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমুন্নত হতে পারে না। সংগঠন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত করার সোপান। সংগঠন একটি আন্দোলনের মেরুদণ্ড। সুনির্দিষ্ট আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে সংগঠন।

সংগঠন ছাড়া ইসলামের সৌন্দর্য-শক্তির সমৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে না। সংগঠন বা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতিত সমাজে ইসলামী আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার ঝান্ডা উড্ডীন করা যায় না।

অসংগঠিত অসংখ্য মানুষ কোন শক্তি নয়। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান সুসংগঠিত মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকও বিশাল শক্তির অধিকারী ও বিজয়ী হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين﴾

"আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।"[৩]

সুতরাং সংগঠন ইসলামের অপরিহার্য শক্তি। সাংগঠনিক ঐক্য ছাড়া সফলতা প্রত্যাশা করা বৃথা। আর তাইতো 'শুব্বান' সাংগঠনিক চেতনায় বিশ্বাসী ও উজ্জীবিত হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পাঁচদফা কর্মসূচি নির্ধারণ করেছে। আমরা এ বিষয়েই সাধ্যমতো ধারণা নেয়ার চেষ্টা করব।

---

২. *সুনান দারিমী।*

৩. *সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৪৯*

শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচি

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ছাড়া কারও পক্ষেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। তাও যদি হয় কোন সংগঠনের বেলায়। সুশৃঙ্খল জীবন ও সাংগঠনিক অবকাঠামো যেকোন ব্যক্তি ও কর্মীর একান্ত কাম্য, তবেই জীবন হয়ে উঠবে সাচ্ছন্দ্যময়, সংগঠন হবে মজবুত, শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের সকলের খুব ভালোভাবে মনে রাখা দরকার যে, যেকোন সংগঠন এর উপাদান চারটি: ০১. নেতা ও নেতৃত্ব, ০২. কর্মী ও আনুগত্য, ০৩. কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি ০৪. শূরা বা পরামর্শ।

উপর্যুক্ত চারটি উপাদানের কোন একটি উপাদান যদি কোন সংগঠনে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেই সংগঠন স্থায়ী হয় না, ভিত নড়বড়ে হয়ে যায় এবং বিশৃংখলা ভাব পরিলক্ষিত হয়। আর যদি কোন একটি উপাদান দুর্বল হয় তাহলে সেই সংগঠন হয়ত চলবে তবে তা হুইল চেয়ারে বসে। উপর্যুক্ত চারটি উপাদান সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রথম দফা

ইসলাহুল 'আক্বীদাহ্ বা 'আক্বীদাহ্ সংশোধন

তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন, খালেস 'ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নেতৃত্ব মনে-প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

'আক্বীদাহ্ বা ধর্মীয় বিশ্বাস এর চেতনার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয় সমাজ, গোত্র, জাতি ও রাষ্ট্র। ব্যক্তির 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস বা চেতনা যদি হয় খাঁটি, স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ তাহলে সেই চেতনায় প্রয়াস থাকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করার। আর এ বিশ্বাস ও চেতনা প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে জাতির সকলের জন্য। আর যদি সেই

'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস বা চেতনার মধ্যে স্বার্থপরতা থাকে, থাকে শোষণের মন্ত্র, তাহলে তা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনে।

'আক্বীদাহ্ সংশোধন কেন?

জগতের সকলেই কোন না কোন আক্বীদায় বিশ্বাসী, এমনকি নাস্তিকরাও! দৃশ্যমান সকল কিছুর উপর প্রবল বিশ্বাস আর অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি প্রবল অবিশ্বাসই হলো নাস্তিকদের বিশ্বাস। যদিও তাদের সেই দাবি ও বিশ্বাস অসাড় ও অযৌক্তিক। আধুনিক বিশ্বে বহুল প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) বলি আর জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলি বা যে কোন জাতীয়তাবাদই হোক না কেন সেগুলোর রব বা প্রভু হলো দেশ ও জাতি। এগুলো ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং, অধর্ম, ভাষা, দেশ, বর্ণ অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে জাতি গঠন করে। কিন্তু মুসলিম মাত্রই একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, কোন ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল এর ভিত্তিতে জাতি গঠিত হবে না, বরং তা হবে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে। মহাকবি আল্লামা ইকবাল সে কথাই বলেছেন-

قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں،

جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں.

ধর্মে হয় জাতি গঠন, ধর্ম নেই তো তুমিও নেই,
নেই যদি মধ্যাকর্ষণ, তারকারাজির সমাবেশ নেই।

কিন্তু এ সকল বিধ্বংসী মতবাদে আজ সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বাসী। অথচ তা এমন বিশ্বাস, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ হলো জাহেলিয়াতের নব্যরূপ, অন্ধকার যুগের প্রধান সম্বল যা একবিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগের লোকেরা বহন করে চলেছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾

অর্থ: "স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো (গোত্রীয়) অহমিকা, জাহেলী যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন আর তাদের অভ্যন্তরে তাক্বওয়ার কথা সুদৃঢ় করলেন এবং এরাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।"[৪]

আয়াতে উল্লিখিত حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ-এর ব্যাখ্যা:

حَـمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ বা জাহেলী অহমিকা ও গোত্রপ্রীতি বলতে ঐ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যখন ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল বিন আমর মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করতে আসলো। সন্ধিপত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখাকে সুহাইল মেনে নিতে পারল না। আর এটা ছিল শুধুমাত্র জাহেলী একগুঁয়েমি ও অহমিকার কারণে। যদিও সে জানত যে এটা সঠিক। নবী (ﷺ) বলেন:

من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية

'যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বা ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়, এমতাবস্থায় যে, সে আসাবিয়্যাহ তথা গোত্র ও দেশপ্রীতির প্রতি আহবান করে অথবা এতে সাহায্য করে তাহলে তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু।[৫]

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, যদি কোন ব্যক্তি বা সৈনিক যুদ্ধ করে তার বংশের জন্য, এলাকার জন্য ও দেশের জন্য অথচ সে জানে যে এটা অন্যায় তাহলে তার এই যুদ্ধ হবে জাহেলী যুদ্ধ। সে মারা গেলে তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু, শহীদি নয়।

---

৪. সূরা আল-ফাত্‌হ, ৪৮ : ২৬।
৫. মুসনাদ আহমাদ, সহীহ মুসলিম।

كَلِمَةُ التَّقْوَى-এর ব্যাখ্যা:

তাক্বওয়ার কালিমা কী? এ ব্যাপারে জাহেলী অহমিকা ও তাক্বওয়ার কালিমাকে এক সাথে করলে আমরা কুরআনের অন্য এক জায়গায় সমাধান পাই। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

"নিশ্চয় তাদেরকে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।) বলতে বলা হলে, তারা অহমিকা প্রদর্শন করতো।"[৬]

সুতরাং জাহেলী অহমিকা, গোত্রপ্রীতি বা দলপ্রীতি তখনই কোন ব্যক্তির মাঝ থেকে বিদূরিত হবে যখন সে কালিমা لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ কে যথাযথ উপলব্ধি করতঃ জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করবে। এই কালিমার মর্মার্থ, তাৎপর্য, এর দাবী সমূহ, এর প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা এবং এই কালিমাই যদি জীবনের লক্ষ্যে পরিণত না হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির মাঝে জাহেলীয়্যাত অবশিষ্ট আছে বলে প্রতীয়মান হবে।

উপর্যুক্ত মতবাদ দু'টি তাগুতের আদি সংস্করণ (Primitive version), যা আধুনিকায়ন (Modernization) হয়েছে, নাম বদলিয়েছে, আরো সুক্ষ্মভাবে চাকচিক্যময় ও আধুনিক মোড়কে পৃথিবীর মানুষের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে। এই আক্বীদাহ বিশ্বাসের বাহ্যিক মোড়ক যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা যদি কোন মুসলমান লালন করে, তবে তার এই বিশ্বাসের কারণে সে ঈমানের আলোকিত জগতের গণ্ডিতে অবস্থান করতে পারবে না। এধরনের 'আক্বীদাহর সংশোধন ছাড়া মুসলমানের মুসলমানিত্ব থাকে না। আর এই মতবাদে বিশ্বাসী বা সেগুলোর প্রতি সামান্যতম দুর্বল কোন ছাত্র-যুবক শুব্বানের কর্মী হতে পারে না। আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী, আমাদের পথ সোজা। তবে তা কন্টকাকীর্ণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র সহায়।

---

৬. সূরাহ আস সাফফাত, আয়াত-৩৫।

'আকীদাহ্-বিশ্বাস সংশোধনের গুরুত্ব:

০১. সকল নবীর দায়িত্ব (Responsibility) ছিল সঠিক 'আকীদাহ্ বা তাওহীদী চেতনা ও বিশ্বাস জমিনে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ

وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ، اَللّٰهُ يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্কে। আর যা আমি ওয়াহী করেছিলাম তোমাকে এবং যা নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্‌রা-হীম, মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)কে— এই বলে যে, তোমরা দীন (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠা করো, আর তাতে মতভেদ করো না। মুশরিকদেরকে তুমি যে বিষয়ে আহ্বান জানাচ্ছ তা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে (তাঁর পথে) চয়ন করে নেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাকে তাঁর দীনের পথে পরিচালিত করেন।"[৭]

এ আয়াতে (الدِّيْن) 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠা বলতে সঠিক 'আকীদাহ্ তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য। এটাই জমহূর মুফাস্‌সিরের অভিমত।

০২. সকল নবী-রাসূল ('আলায়হিমুস্ সালাম)-কে এ সকল অসাড় ও মূল্যহীন আদর্শের মূলোৎপাটন এবং খালেস তাওহীদের গোড়াপত্তন করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴾

৭. সূরা আশ্ শূরা- ৪২:১৩।

"আল্লাহর ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশনা দিয়েই তো আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি।"[৮]

০৩. তাগুত ও বাতিলের সাথে খালেস তাওহীদপন্থীরা কোন ধরনের আপোষ (Compromise) করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾

"জেনে রেখো, একনিষ্ঠ ইবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য।"[৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"আর তারা কেবল এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা সালাত আদায় করবে আর যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন।"[১০]

০৪. তাওহীদ ও তাওহীদের বাণী- لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ একটি বৃক্ষের ন্যায় যা তাগুতের ছায়ায় বা আশ্রয়ে থেকে বড় হতে পারে না, এর জন্য চাই তাগুতমুক্ত উর্বর ভূমি। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

"তুমি কি দেখো না, কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায় যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত।"[১১]

---

৮. সূরা আন্ নাহ্ল ১৬:৩৬।
৯. সূরা আয্ যুমার ৩৯:৩।
১০. সূরা আল বাইয়্যিনাহ্ ৯৮:৫।
১১. সূরা ইব্রা-হীম ১৪ : ২৪।

০৫. তাওহীদপন্থীরা যতদিন থাকবে পৃথিবীর অস্তিত্ব ততদিন থাকবে, তাওহীদপন্থীরা না থাকলে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। নবী (ﷺ) বলেছেন:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِيْ الأَرْضِ: اللّٰهُ اللّٰهُ.

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে।[১২] সুতরাং পৃথিবীর স্থিতিশীলতার জন্য তাওহীদপন্থীদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

০৬. পৃথিবীতে শান্তি, প্রগতি ও নিরাপত্তার জন্য তাওহীদপন্থীদের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। কারণ, যারা শির্কমুক্ত খালেস তাওহীদ মনে প্রাণে গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে আর যুল্ম (অর্থাৎ- শির্ক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।"[১৩]

০৭. তাওহীদপন্থীদের উপরে যুগে যুগে নির্যাতন নেমে এসেছে। তারা সেসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, কখনো তাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচি থেকে পিছপা হবে না। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত ঝাঁপ দিতে হলেও তারা তাদের তাওহীদের স্বীকৃতি ও আদর্শ থেকে এক বিন্দুও নড়বে না। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বুরূজ-এ আসহাবুল উখদুদ বা গর্তওয়ালাদের ঘটনা উল্লেখ করে ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের সে শিক্ষাই দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

---

১২. সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২২০৭, হাদীসটি সহীহ।

১৩. সূরা আল আন'আম ৬ : ৮২।

অর্থ: "তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল একমাত্র এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রান্ত প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"[১৪]

০৮. তাওহীদপন্থী ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের কেটে টুকরো টুকরো করা হলেও তারা শির্ক করবে না ও বাতিলের কাছে মাথা নত করবে না। নবী (ﷺ) বলেছেন: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ.

অর্থ: তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হোক বা আগুনে পুড়ে মারা হোক তথাপি তুমি শির্ক করবে না।[১৫]

০৯. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, বিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। সুতরাং আইন ও বিধান, জীবনব্যবস্থা বা মানবজীবন পরিচালনার রূপরেখা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হতে হবে। সমগ্র মানবজাতির সংবিধান (Constitution of Mankind) হচ্ছে আল কুরআন। কারণ মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের আবরণে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (নিরঙ্কুশ ক্ষমতা) তাঁর। মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[১৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ

---

১৪. সূরা আল বুরূজ ৮৫ : ৮।

১৫. সুনান ইবনু মাজাহ- হা: ৪০৩৪, হাদীসটি হাসান।

১৬. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৫৪।

شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"অতঃপর কষ্টের পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি শান্তি-তন্দ্রা প্রেরণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করল এবং অন্যদল মূর্খের মতো আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ পূর্বক নিজেরাই নিজেদের জীবনকে উদ্বেগাকুল করে বলল, কাজ-কর্মের ব্যাপারে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) আমাদের কিছুমাত্র অধিকার আছে কি? বলো, **'সমস্তই আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অধিকারভুক্ত'**। তারা এমন সব কথা অন্তরে পোষণ করে— যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'যদি মতামত প্রদানের অধিকার আমাদের কিছুমাত্র থাকত, তাহলে আমরা এ স্থলে নিহত হতাম না'। বলে দাও, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে, তথাপি যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল, তারা তাদের এ মৃত্যুশয্যার পানে বের হয়ে পড়ত' এবং এজন্যও যে আল্লাহ তোমাদের অন্তরস্থিত বিষয়গুলো পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরস্থ বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করেন বস্তুত, আল্লাহ সকলের অন্তরের কথা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।"[১৭]

১০. তাওহীদ হলো দ্বীনের মূলভিত্তি, তাওহীদ ছাড়া কোন 'আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

"আমি আপনার আগে যত রাসূলকে প্রেরণ করেছি তাদের প্রত্যেককে এ মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলাম যে, নিশ্চয়ই আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, অতএব, তোমরা আমারই উপাসনা কর।"[১৮]

---

১৭. সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৫৪।
১৮. সূরা আম্বিয়া, ২১:২৫।

তাওহীদের দাবি (Demand of Tawheed):

০১. তাওহীদের প্রথম দাবি হলো— সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ, তাগুতের অস্বীকার ব্যতিত তাওহীদ পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয়ই হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগূতকে (মিথ্যা মা'বূদদেরকে) অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল, যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।"[১৯]

০২. তাওহীদের দ্বিতীয় দাবি হলো মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে দমন করা। মুশরিক ও তাগূতপন্থীরা তাদের প্রবৃত্তিকে রব বা প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে। তারা সেই আইন সমাজে চালু করে যা তাদের প্রবৃত্তি দাবি করে। তারা তাঁদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী আইন তৈরি করে। আবার প্রবৃত্তির বিরোধী হলে তা পরিবর্তন করে, সংযোজন-বিয়োজন (Amendment) করে। যারা এরকম করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি, যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গোমরাহ করেছেন আর তার কানে ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের ওপর টেনে

১৯. *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৬।*

দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহর পর আর কে আছে যে তাকে সঠিক পথ দেখাবে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?"[২০]

০৩. তাওহীদের তৃতীয় দাবি হলো, সমাজে প্রচলিত সকল প্রকার শির্ক বর্জন করা। চাই তা 'আক্বীদাহগত হোক বা 'আমলী হোক। বিশ্বাসগত শির্ক যেমন- অমুক পীর সাহেব মানুষের উপকার করার ক্ষমতা রাখেন, সম্পদশালী করার ক্ষমতা রাখেন, সন্তান দেয়ার মালিক তিনি ইত্যাদি অনেক শির্কী বিশ্বাস আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে বিদ্যমান। ইসলামের নাম দিয়ে ধর্ম ব্যবসা খুলে বসেছে ধর্ম ব্যবসয়ীরা। কোটি কোটি টাকার জমজমাট ব্যবসা শুরু করেছে তথাকথিত পীরেরা। আর তাদেরকে সমর্থন (Support) দিয়ে চলছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনরা।

কর্মগত শির্ক হচ্ছে পীরের দরবারে কোন কিছু চাওয়া, মাযারে নযর মানা, ওরস শরীফ পালন করা, মাযারে গিয়ে দু'আ করা, পীরের নামে গরু-ছাগল যবেহ করা, কারো মৃত্যুতে শোক পালন করতে গিয়ে নীরবতা পালন করা, কারো মাযারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ইত্যাদি অরো অসংখ্য-অগণিত শির্কী কাজ আমাদের সমাজে প্রচলিত। এ বিষয়ে পৃথক একটি পুস্তিকা দরকার। সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে ধোঁকায় ফেলে এ সকল শির্কী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে। বর্তমানে পীরের ব্যবসা আরো রমরমা হচ্ছে দিন দিন।

উপর্যুক্ত 'আক্বীদাহগুলো সংশোধন করা না হলে কিয়ামতের দিন তারা যেমন পরিত্রাণ পাবে না, ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মী তার জীবনের কর্মসূচিতে এ সকল 'আক্বীদাহর অনুসারীদের সঠিক পথে আহ্বান না করলেও আল্লাহর নিকটে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

সুতরাং সকল প্রকার পীরপূজা, কবরপূজা, মাযার পূজা, মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা, গাছ পূজা, মাছ পূজা, পশু-পাখি পূজা, ব্যক্তি ও দল পূজা, দেশ পূজা, মানব-রচিত সংবিধান পূজাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা ও জনসাধারণকে আল্লাহর 'ইবাদতের দিকে আহ্বান করা তাওহীদের তৃতীয় মৌলিক দাবি।

---

২০. সূরা আল জা-সিয়াহ্ ৪৫ : ২৩।

'আক্বীদাহ্ সংশোধনের দ্বিতীয় দিক- রিসালাতে বিশ্বাস:

রিসালাতে মুহাম্মদী বা নবুওয়াতের সার্বজনীনতার দাবিসমূহ হলো:

০১. নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনীত জীবনব্যবস্থাই একমাত্র গ্রহণীয় ও পালনীয় জীবনব্যবস্থা—এই বিশ্বাস পোষণ করা। শান্তিময় পৃথিবী গড়ার জন্য ইসলামই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা বা Way of Life।

মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।"[২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে (তার জেনে রাখা দরকার যে) কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবূল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২২]

০২. রিসালাতে মুহাম্মদীর দ্বিতীয় দাবি হলো— নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াতকে সর্বজনীন পন্থা হিসাবে গ্রহণ করা। তাঁর নবুওয়াতকে সকল স্থানে, সকল বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলের জন্য কিয়ামত অবধি সমভাবে গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

"বলো, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর বার্তাবাহক, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান।

২১. *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৯।*

২২. *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৮৫।*

সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করেন। আর তোমরা তাকেই অনুসরণ করো, তবে তোমরা পথ প্রাপ্ত হবে'।"[২৩]

০৩. নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী ও রাসূল হিসেবে গ্রহণ করা। একথা বিশ্বাস করা যে, তারপরে আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

"মুহাম্মাদ স. তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাত।"[২৪]

"অতএব 'মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল' এই স্বীকারোক্তির অন্যতম তাৎপর্য এই যে, তাঁহার নবুওত ও রিসালত কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ভূভাগের প্রতি প্রান্ত এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ তাঁহার বিশ্বজনীন নবুওতের সাম্রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি দুন্‌য়ার ক্ষুদ্রতম কোন অংশকেও নবী সম্রাট মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতের সাম্রাজ্য-বহির্ভূত বলিয়া ধারণা করে, নিখিল বিশ্বের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ, জাতি ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করার অপরিহার্যতাকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহর রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি তাহার ঈমান কায়েম হয় নাই। ইহা ভাববিলাসের অভিব্যক্তি নয়, ইহা ঈমানীয়াতের বুনিয়াদী বিধান।"[২৫]

"মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাগরতীর্থে দেশ, ভাষা, বর্ণ, অবস্থা, বংশ ও ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানবসন্তানকে মিলিত হইবার জন্য একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) আহ্বান জানাইয়াছেন। One Nation

---

২৩. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৫৮।

২৪. সূরা আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৪০।

[২৫] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪

Theory অর্থাৎ এক জাতীয়তার পরিকল্পনার আধুনিক শ্লোগান যদি ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানবসন্তানদিগকে শোষণ ও গলাধঃকরণ করার প্রোপাগাণ্ডা মাত্র না হয়, তাহা হইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁহার বহু বিশ্রুত ভ্রাতৃত্বের আহ্বানকে মান্য করিয়া লওয়া ছাড়া কাহারো গত্যন্তর নাই।"[২৬]

০৪. রিসালাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দাবি হলো, নবী (ﷺ)-এর রিসালাতকে জীবন পরিচালনার সকল দিক ও বিভাগে মেনে নেয়া, সেটির উপরে সন্তুষ্ট থাকা ও মনে কোন সংকোচবোধ না রাখা।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদে মীমাংসার ভার তোমার ওপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা (তাতে) নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"[২৭]

০৫. এর আরেকটি দাবি হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ মনে করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

"আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবূল করে নিলাম। তবে, কেউ পাপ

---

[২৬] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪১

২৭. *সূরা আন্ নিসা ৪ : ৬৫।*

করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় নিষিদ্ধ বস্তু খেতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৮]

০৬. রিসালাতে মুহাম্মাদীর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দাবি হলো নবী (ﷺ)-কে নিজের পিতা-মাতা, সন্তান, দুনিয়ার সকল মানুষ এমনকি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসা। নবী (ﷺ) বলেছেন:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান, এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে ভালবাসার পাত্র না হব।[২৯]

০৭. প্রত্যেক মুসলিমের নিকট বিশেষত, ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর নিকট রিসালাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দাবি হলো, তারা যেকোন পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর অটুট থেকে রাসূলের দেখানো পথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে। উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর নিকটে যখন শয়তান এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) মারা গেছেন। এই সংবাদ শোনার পর কতিপয় সাহাবী এই কথা বলে ফেললেন যে, তাহলে আর যুদ্ধ করে লাভ কী? সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

"মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বে আরো অনেক রাসূল গত হয়েছে; কাজেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়াবে? এবং যে ব্যক্তি উল্টোদিকে

---

২৮. *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩।*

২৯. *সহীহুল বুখারী- হা: ১৫, সহীহ মুসলিম- হা: ৭০/৪৪।*

ফিরে দাঁড়ায় সে আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে অতিশীঘ্র বিনিময় প্রদান করবেন।"[৩০]

০৮. রিসালাতে মুহাম্মাদীর আরেকটি দাবি হলো রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা তাঁর জীবনাদর্শের কোন ছোট্ট বিষয়ে সামান্যতম তাচ্ছিল্যভাব বা কটাক্ষ (Insult) করা যাবে না। যারা এ রকম করে তারা মুনাফিক্ব, বেদীন ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

"বলো, 'আল্লাহ্, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফ্‌রী করেছ। তোমাদের মধ্যকার কাউকে কাউকে ক্ষমা করলেও অন্য দোষীদেরকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী।"[৩১]

০৯. রাসূল (ﷺ) প্রদর্শিত সকল বিধান চাই তা 'ইবাদত, লেনদেন, বা পারিবারিক সংক্রান্ত হোক সেই বিধানকে তার দেয়া পদ্ধতি (System) অনুযায়ীই পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন মাযহাব, তরিকা, পীর, ইমাম বা অন্য কোন কিছুর দোহাই দিয়ে বিধান পরিবর্তন বা এর পদ্ধতি পরিবর্তন করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো, আর তোমাদেরকে যা হতে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"[৩২]

---

৩০. সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৪৪।
৩১. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৫-৬৬
৩২. সূরা আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭।

যে সকল ইমামের নামে মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে, তারা কেউই পরিগৃহীত মাযহাবের প্রবক্তা ছিলেন না। তারা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন এবং ইজতিহাদী কথা বা মতামত রাসূলের বাণীর বিপরীত হলে তাদের মতামতকে ছুঁড়ে ফেলতে বলেছেন। যেমন ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

مَنْ استبانت له سنة من سنن النبي فَلا يحل له أن يدعها بِقَوْلِ أَحَدٍ كائنا من كان.

যে ব্যক্তির নিকট রাসূল (ﷺ)-এর কোন সুন্নাত সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়, তার জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য কারো কথায় কর্ণপাত করে সেই প্রমাণিত সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে। সে যেই হোক না কেন।

১০. রিসালাতে মুহাম্মাদীর আরো দাবি হলো যে, নবী (ﷺ)-এর আহ্‌লে বাইত তথা পরিবারবর্গকে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানীয় মনে করা। এবং তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা। তাদেরকে অপমানিত না করা এবং কোন বিষয়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা।

এ মর্মে নবী (ﷺ) থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে আমরা দরুদে ইবরাহীমে যা পাঠ করি — তা স্মরণ করাতে চাই-

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (ﷺ) এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার বংশধরের ওপরও, যেভাবে আপনি ইবরাহীম ও তার বংশধরের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন।"

তবে তাদের প্রতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করা মোটেই ঠিক নয়।

সেইসাথে সাহাবায়ে কিরামকে সম্মানিত মনে করা ও সম্মান প্রদর্শন করা। কোনভাবেই তাদেরকে অপমানিত না করা এবং তাদেরকে গালিগালাজ না করা। কেননা, কুরআন বলছে—

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠) } [التوبة: ١٠٠، ١٠١]

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা।[৩৩]

ইসলাহুল 'আক্বীদাহ্ বা 'আক্বীদাহ্ সংশোধনের উপরিউক্ত দু'টি দিক তথা খালেস তাওহীদ ও রিসালাতে মুহম্মাদী (ﷺ)-এর সহজ রূপ হলো, আল্লাহ তা'আলাকে সকল কিছুর স্রষ্টা, সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ও সকল ক্ষমতার উৎস মনে করে তাকেই একমাত্র মা'বূদ হিসাবে মেনে নিতে হবে। আর নবী মুহম্মাদ (ﷺ)-এর ইমামত বা নেতৃত্বকে (Leadership) জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে, তবেই 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় দফা

আদ্-দা'ওয়াহ ওয়াত্ তাবলীগ বা আহবান ও প্রচার (Calling and Preaching): ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা।

ছাত্র ও যুব সমাজ হলো যেকোন সমাজ ও জাতির চালিকাশক্তি। তাদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি (Anti-Islamic power) সদা তৎপর। শিক্ষাব্যবস্থা (Education system), শিক্ষার উপকরণ (Material of education), শিক্ষার উদ্দেশ্য সবকিছুই যেন ইসলাম বিরোধী। আর ছাত্র ও যুব সমাজের মগজ ধোলাই (Brain

৩৩. *সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১০০*

wash) দেয়া হয়েছে এভাবে যে, ইসলাম মানেই পশ্চাতমুখীতা (Backdated), আধুনিকতা বিরোধী (Anti-Modernity)। বাস্তবিকপক্ষে, এগুলো হলো— ইয়াহূদী-খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অপপ্রচার, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (Psychological War) ও স্নায়ু-যুদ্ধের (Cold war) ফল, যা তথাকথিত নামধারী বুদ্ধিজীবিরা গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্যানভাস করে যাচ্ছে। বিশেষ করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের তাই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, যা বিধর্মীরা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরেও ইসলামের বিরোধীতা করতে তারা পিছপা হচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে যে, একটি বিশেষ মহল এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যাদের প্রথম কাতারে রয়েছে তথাকথিত মুক্ত চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধির দাবিদার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও কতিপয় নাস্তিক কলামিস্ট। তাদের হীন ষড়যন্ত্রের জালে পা দিয়ে ঈমানহারা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার ছাত্র ও যুবশ্রেণি।

সুতরাং তাদের নিকটে ইসলামের প্রকৃত রূপ (Original structure) তুলে ধরা, ইসলামের বিষয়াবলিকে যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা ইসলামী সংগঠনের প্রত্যেকটি কর্মীর ঈমানী দায়িত্ব। দা'ঈ ও মুবাল্লিগদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"কথায় কে বেশি উত্তম ঐ ব্যক্তি থেকে যে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহবান করে, আর সৎ কাজ করে এবং বলে, 'আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'।"[৩৪]

উল্লিখিত ফযীলতের জন্য দা'ঈদের ৩টি শর্ত পালন করতে হবে-

০১. দা'ওয়াত ও তাবলীগ হবে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর পথের দিকে।

০২. দাঈ' ও মুবাল্লিগদেরকে 'আমলে সালেহ করতে হবে।

০৩. নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতে হবে।

---

৩৪. সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত ৪১ : ৩৩।

ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীকে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, হক্ব ও সত্যের দা'ওয়াত দিলে অবশ্যই তার ওপর জেল যুল্ম নির্যাতন নেমে আসবে। এটাই জগতের নিয়ম। নূহ্ ('আলায়হিস্ সালাম) থেকে মুহম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তী হক্বপন্থী সকল 'আলেমের ওপরে যুল্ম-নির্যাতন, সম্মানহানী ও বিপদাপদ নেমে এসেছে। লুক্বমান ('আলায়হিস্ সালাম) তার সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন এভাবে যে,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

"হে বৎস! তুমি সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[৩৫]

একজন কর্মীকে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, হক্ব কথা বলতে গিয়ে বিশ্ববরেণ্য মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতো ব্যক্তিকেও কমপক্ষে আট বার জেলে যেতে হয়েছিল। এমনকি জেলখানায় তার মৃত্যু হয়েছিল। ভারত উপমহাদেশে তাওহীদী সালাফী আন্দোলনের সিপাহসালার আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীকে ইংরেজ বিরোধী বক্তব্য দেয়ার কারণে দু'বার কারাবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের দা'ওয়াতী মিশন থেমে থাকেনি।

জলধিবক্ষে প্রচণ্ড বাতাস যেমন ঊর্মিমালাকে উদ্বেগাকুল করে তোলে, নির্বাপিত তুষের আগুনে সামান্য ফুঁ দিলে যেভাবে তা ভষ্মিভূত করার লালসা নিয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, খরস্রোতা নদীর প্রবাহকে বন্ধ করার জন্য বাঁধ দিলে যেমন তা আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে কয়েকগুণ বেশি শক্তি সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি জেল-জুলুম, নির্যাতনের সম্মুখে পড়ে প্রকৃত মুমিনের ঈমানের তেজস্বিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

একজন আরব কবি বলেন:

تعز فلا شيئ على الأرض باقيا

---

৩৫ সূরা লুক্বমান ৩১ : ১৭।

ولا وزر مما قضى الله واقيا

অর্থাৎ- তুমি সবর কর, কেননা পৃথিবীতে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর আল্লাহর ফায়সালা থেকে রক্ষাকারী কোন আশ্রয়স্থলও নেই।

এক্ষণে আমরা দা'ওয়াতের কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করব।

দা'ওয়াতের মূলনীতি (Principles of Dawah)

০১. ইসলামের সঠিক 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের দিকে আহ্বান: দা'ওয়াতের প্রথম মূলনীতি হলো প্রথমত মানুষকে ইসলামের সঠিক 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মানুষের কর্মের হিসাব নেয়া হবে।

সুতরাং প্রথম দা'ওয়াত হবে 'আক্বীদাহ্ সংশোধনের দিকে। আর 'আক্বীদাহ্ সংশোধন মানে হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা, তাকে রব ও ইলাহ হিসাবে মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা নূহ্ ('আলায়হিস্ সালাম)-এর ব্যাপারে বলেন:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

"আমরা তো নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর 'ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।"[৩৬]

আর তাওহীদের গোড়াপত্তন ও শির্‌কের/তাগুতের মূলোৎপাটনই ছিল সকল নবী-রাসূল ('আলায়হিমুস্ সালাম)-গণের প্রথম ও প্রধান মিশন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

---

৩৬. *সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৫৯।*

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমরা রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত করো আর তাগূতকে বর্জন করো।"[৩৭]

০২. দা'ওয়াতের অন্যতম অব্যর্থ মূলনীতি বলা যেতে পারে দা'ঈকে প্রথমে মাদ'উর রোগ নির্ণয় করতে হবে। যেমন- একজন রোগী ডাক্তারের নিকট গেলে তিনি প্রথমে তাকে পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর রোগ নির্ণয় করেন, অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চিকিৎসা প্রদান করেন, রোগ নির্ণয় না করেই যদি সবাইকে একই ঔষধ প্রদান করেন, তা যেমন হবে চরম বোকামী তেমনি অত্যন্ত ক্ষতিকর। একজন দা'ঈ মানুষের ক্বলব বা রূহের চিকিৎসক।

সুতরাং তিনি প্রথমে যাকে দা'ওয়াত দিবেন তার সমস্যা নির্ণয় করবেন, তারপর সেটার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। সবাইকে একই দা'ওয়াত দেয়াটা বোকামী ছাড়া কিছুই না।

০৩. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে দা'ওয়াত: ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করতে হবে, শাখা-প্রশাখার দিকে নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামের দা'ঈদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, আজকাল অনেক দা'ঈ মানুষকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন মতভেদপূর্ণ প্রশাখাগত মাস'আলার দিকে। যেখানে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি হচ্ছে উপেক্ষিত; প্রাধান্য পাচ্ছে ছোট-খাটো বিষয়গুলো। দা'ঈদের জন্য এটি একটি ভয়ানক পদস্খলন। যেই দা'ওয়াতের মাধ্যমে নবী (ﷺ) বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, সেই দা'ওয়াতের মাধ্যমে সমসাময়িককালের কতিপয় দা'ঈ ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বিভক্ত করে চলেছেন, যা একটি পদ্ধতিগত ভুল। সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে, মসজিদ ভেঙ্গে যাচ্ছে, এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মাঝে, এর প্রতিকার করা খুবই জরুরি।

নবী (ﷺ) মানুষের হৃদয়পটে তাওহীদের বীজ বপন করেছিলেন, মানুষের মনের তালা ভেঙ্গেছিলেন, ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তারাই মূর্তি সংহারের জন্য বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই হলো মোটামুটি দা'ওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি মূলনীতি।

---

৩৭. সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৩৬।

এখন আমরা দা'ঈর কিছু গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইন-শা-আল্লাহ্।

দা'ঈর গুণাবলি (Characteristics of a Dayee)

০১. ইখলাস তথা একনিষ্ঠতাঃ ইখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা একজন দা'ঈর প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা 'আক্বীদাহর গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য যদি হয় পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিল বা যশ ও খ্যাতি অর্জন, তবে সেই দা'ওয়াতী মিশন কখনো সফল হবে না। সেইসাথে দাঈ'র সেই দা'ওয়াতী কর্মসূচি হবে পণ্ডশ্রম মাত্র। এর মাধ্যমে পার্থিব কিছু উপকার হলেও পরকালে তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। শুধু দা'ওয়াত নয় মু'মিন জীবনের সকল কাজে সফলতার ভিত্তি হলো ইখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"আর তারা কেবল এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহর 'ইবাদত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা সালাত আদায় করবে এবং যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন।"[৩৮]

এজন্যই বলা হয়- أخلص دينك يكفيك العمل القليل

তুমি একনিষ্ঠতা অবলম্বন করো, অল্প 'আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

০২. 'আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

---

৩৮. *সূরা আল বাইয়্যিনাহ্ ৯৮ : ৫।*

"কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। আর তুমি তোমার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"[৩৯]

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমত জ্ঞানার্জনের কথা উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয়ত ইস্তেগফার তথা নিজের গুনাহ মাফ নেয়ার জন্য 'আমলের উৎসাহিত করেছেন। কারণ যেখানে জ্ঞান নেই সেখানে বিরাজ করে অন্ধকার, মূর্খতা, বর্বরতা কিংবা উদারতার নামে বিসর্জন। তাই একজন দা'ঈকে দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে সে বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

০৩. ব্যক্তিজীবনে 'আমল: দা'ঈ যে বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবেন তা প্রথমে নিজের জীবনে এবং নিজের পরিবারে বাস্তবায়ন করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"কথায় কে বেশি উত্তম ঐ ব্যক্তি থেকে যে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে, আর সৎ কাজ করে এবং বলে, 'আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'।"[৪০]

০৪. সত্যবাদিতা: এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে। সত্যবাদীদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৪১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

---

৩৯. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯।

৪০. সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত ৪১/৩৩।

৪১. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৯।

"আল্লাহ বলবেন, 'এটা সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে; তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই মহাসফলতা'।"[৪২]

০৫. আখিরাতমুখী হওয়া ও দুনিয়াকে প্রাধান্য না দেয়া: দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশে লিপ্ত হওয়া অন্তরের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর; যা মানুষের জীবন্ত অন্তরকে মৃত অন্তরে রূপান্তরিত করে। একজন মানুষ দুনিয়ার কাজে যত বেশি লিপ্ত হয়, আখিরাত থেকে সে ততবেশি দূরে অবস্থান করে। দুনিয়া তার নিত্য-নতুন সব চাকচিক্য নিয়ে উপস্থিত হয়, যদিও সেগুলো প্রাণহীন, অসাড়। নবী (ﷺ) বলেন:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ،

অর্থ: "নিশ্চয়ই দুনিয়া হলো অত্যন্ত সুমিষ্ট, শস্য-শ্যামল, আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তোমাদের প্রতিনিধি করে দেখতে চান যে, তোমরা কি করো। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে আর নারী থেকে বেঁচে থাকো।"[৪৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ﴾

"হে মানুষ! আল্লাহর ওয়া'দা সত্য, কাজেই পার্থিব জীবন কিছুতেই যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে; আর সেই প্রধান প্রতারক (শয়ত্বান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।"[৪৪]

দুনিয়ার প্রতি এত মোহ, কীভাবে আমরা এ থেকে মুক্তি পেতে পারি? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে

---

৪২. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ১১৯।
৪৩. সহীহ মুসলিম- হা: ৯৯/২৭৪২।
৪৪. সূরা ফা-ত্বির ৩৫ : ৫।

বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য আর পরকালের মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য। একথা সে সর্বদাই স্মরণ করতে থাকে তাহলে আশা করা যায় দুনিয়ার প্রতি তার মুহব্বত অনেকাংশে কমে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

"বলো, 'পার্থিব ভোগ সামান্য, যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাতই উত্তম, আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না'।"[৪৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾

"তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা টিকে থাকবে।"[৪৬]

তাই বলে দুনিয়ায় ঈমান ও আমলের প্রচার-প্রসারে নিজকে নিবৃত করা থেকে বিরত রাখা মোটেই ঠিক নয়।

দা'ঈ হিসেবে নিজের যোগ্যতা অর্জন ও দা'ওয়াতের নিত্য-নতুন আধুনিক উপকরণ ব্যবহারে পিছিয়ে থাকাকে কোনভাবেই আখিরাতমুখী মনোভাব বলা যায় না।

মোটকথা, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া, তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদগ্র বাসনা, আখিরাতের স্মরণ ও জবাবদিহিতার ভয় এবং আল্লাহর ক্রোধ ও জাহান্নামের ভয়াবহতার স্মরণই মানুষকে আখিরাতমুখী করতে পারে।

০৬. ধৈর্য: সবর বা ধৈর্যধারণ করা দা'ঈদের জন্য অন্যতম একটি গুণ, যা দা'ওয়াতের ময়দানে সফলতার জন্য সর্বোচ্চ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সবর ইসলামের অন্যতম ফরয একটি বিধান, যা ঈমানের অর্ধেকও বটে। পবিত্র কুরআনে ৮০ বারেরও অধিক সবরের আলোচনা এসেছে। যেমন-

---

৪৫. সূরা আন্ নিসা ৪ : ৭৭।

৪৬. সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৯৬।

(০১) আল্লাহ সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে বলেছেন:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৪৭]

(০২) আল্লাহ সবরকারীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

"কাজেই তুমি ধৈর্য ধরো যেমনভাবে ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না।"[৪৮]

(০৩) আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾

"আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"[৪৯]

(০৪) আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পাশে থাকেন।"[৫০]

(০৫) ধৈর্যে মেওয়া ফলে: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾

"আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম।"[৫১]

(০৬) ধৈর্যের প্রতিদান বেহিসাব/অগণিত:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"ধৈর্যশীলদের প্রতিদান পূরণ করে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই।"[৫২]

(০৭) ধৈর্যশীলরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

---

৪৭. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪৫।

৪৮. সূরা আল আহ্ক্বা-ফ ৪৬ : ৩৫।

৪৯. সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৪৬।

৫০. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৩।

৫১. সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৫।

৫২. সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ১০।

"নিশ্চয়ই এতে রয়েছে ধৈর্যশীল আর কৃতজ্ঞ বান্দাদের জন্য নিদর্শন।"[৫৩]

(০৮) ধৈর্য ধরলে জান্নাত পাওয়া যায়:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

"তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর!"[৫৪]

(০৯) ধৈর্যের মাধ্যমেই দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়।

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

"আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক সৎপথ প্রদর্শন করত যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।"[৫৫]

এই আয়াতে উপদেশ রয়েছে ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীর জন্য। কারণ এই আয়াতে কারীমা আমাদের বলে দিচ্ছে নেতৃত্ব অর্জনের অন্যতম শর্ত (Condition) কী? আর তাহলো ধৈর্যধারণ করা।

এভাবে করে পবিত্র কুরআনে সবরের অনেক সুন্দর সুন্দর উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেন:

ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر.

" মানুষকে যত কল্যাণকর নিয়ামত দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে সবরের তুলনায় প্রশস্ত ও উত্তম কোন কিছুই তাকে দেয়া হয়নি।"[৫৬]

নবী (ﷺ) আরো বলেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

৫৩. সূরা ইবরা-হীম ১৪ : ৫।
৫৪. সূরা আর্ রা'দ ১৩ : ২৪।
৫৫. সূরা আস্ সাজদাহ্ ৩২ : ২৪।
৫৬. সহীহুল জামে'- হা: ৫৬২৬।

"মু'মিনের বিষয় আশ্চর্যজনক। তার প্রত্যেকটা কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এই সৌভাগ্য শুধু মু'মিনের জন্যই। অন্য কারো জন্য নয়। (আর তা এই কারণে যে,) কোন শুভসংবাদ এলে সে শুকরিয়া আদায় করে তা তার জন্য কল্যাণকর। আবার যদি বিপদ আসে তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে তাও তার জন্য কল্যাণকর।"[৫৭]

ইসলামী সংগঠনের কর্মীরা আম্বিয়া 'আলায়হিমুস্ সালাম, সাহাবায়ে কিরাম, অতীত যুগের উৎসর্গিত প্রখ্যাত-বিদগ্ধ মুসলিম মনীষার জীবনী অধ্যয়ন করবে। এই পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াকু জানবাজ মর্দে মুজাহিদদের জীবনী আত্মস্থ করবে, তাহলে ধৈর্যের সুফল সে স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে। আল্লাহর নবী নূহ ('আলায়হিস্ সালাম) দীনের দা'ওয়াত প্রদানে যে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলেন, তা অধ্যয়ন করে একজন দা'ঈ তার জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে অনুধাবন করতে পারবে। আমাদের প্রিয়নবী (ﷺ) দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের যে বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তা যদি একজন দা'ঈকে উজ্জীবিত না করে তাহলে কার্যত তার দা'ওয়াত সফল হবে কী করে? অতীতের সালাফগণ যুগ, পরিবেশ ও সমাজে ধৈর্য ধারণের কঠিন পরীক্ষায় যেমন সফল হয়েছেন তেমনি বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতে তাওহীদের দা'ঈদেরকেও চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। মূলত সবর বা ধৈর্যধারণ বিষয়টি স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকার দাবি রাখে।

০৭. দয়াদ্রতা: একজন সফল দা'ঈর জন্য দয়াদ্রতা, রহমদিল হওয়া একান্ত জরুরি। দয়ার ব্যাপারে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বিখ্যাত কিছু বাণী-

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

"যে মানুষের প্রতি দয়া করে না সেও দয়া প্রাপ্ত হবে না।"[৫৮]

لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ

৫৭. সহীহ মুসলিম- মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা: ৬৪/২৯৯৯।
৫৮. সহীহুল বুখারী- মা: শা:, হা: ৭৩৭৬।

"কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তির নিকট থেকেই রহমত ছিনিয়ে নেয়া হয়।"[৫৯]

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"দয়াকারীদের উপর আল্লাহ দয়া করেন। জমিনবাসীর উপর তোমরা দয়া কর, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[৬০]

একদা নবী (ﷺ) হাসান (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে চুমু দিচ্ছিলেন, পাশেই আকরা ইবনু হাবেস অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, কিন্তু আমি তো কাউকে চুমু দেই না। নবী (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন:

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

"যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।"[৬১]

মোটকথা, মানুষের প্রতি দয়া তো বটেই বরং সকল সৃষ্টিকুলের প্রতিও দয়া করতে হবে। এটাই ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। সেই বিখ্যাত হাদীসটি আমাদের সকলের জানা যে, "একজন মহিলা একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার কারণে জাহান্নামী হয়েছিল। অপরদিকে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক অসতী মহিলা জান্নাতী হয়েছিল।"[৬২] রহমাতুল লিল আলামীন নবী করীম (ﷺ)-এর দয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই পীড়াদায়ক। তিনি

---

৫৯. *সুনান আবূ দাউদ- মা: শা:, হা: ৪৯৪২।*
৬০. *সুনান আবূ দাউদ- মা: শা:, হা: ৪৯৪১, সহীহ।*
৬১. *সহীহুল বুখারী- মা: শা:, হা: ৫৯৯৭।*
৬২. *সহীহুল বুখারী, হা. ৩৪৬৭।*

হচ্ছেন তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।"[৬৩]

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ) এর দয়া, উদারতা বুঝানোর জন্য তার দু'টি সিফাত বা গুণাবলি رَءُوفٌ (রউফ) رَحِيمٌ (রহীম) ব্যবহার করেছেন যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি। উম্মাতের প্রতি নবী (ﷺ)-এর দয়া মুহাব্বাত কত বেশি ছিল তা উপলব্ধি করানোর জন্য এ শব্দ দু'টিই যথেষ্ট। আর একজন দা'ঈকেও সেই অনুপম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া উচিত।

০৮. বিনয়-নম্রতাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"মু'মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার (দয়ার) পাখা বিছিয়ে দাও।"[৬৪]

নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় কুরাইশরা নবী (ﷺ)-কে প্রস্তাব দিলো যে, আপনার সঙ্গী-সাথীরাতো অধিকাংশই দুর্বল, অতএব আমরা আপনার নিকট আসলে আপনি তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিবেন। কারণ আমাদের মতো সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঐসব দুর্বল লোকদের সাথে উঠা-বসা করতে পারে না। তাদের এই উদ্ভট কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াতটি নাযিল করলেন।

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾

"তুমি দৃঢ় চিত্ত হয়ে তাদের সাথে অবস্থান করো যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।"[৬৫]

---

৬৩. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১২৮, সহীহুল বুখারী- মাঃ শাঃ, হাঃ ৪৬৭৯।

৬৪. সূরা আশ্ শু'আরা- ২৬ : ২১৫।

৬৫. সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ২৮।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে অহংকার প্রদর্শন থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন- লুক্বমান ('আলায়হিস্ সালাম)-এর যে উপদেশ তিনি তার সন্তানকে দিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা তা উল্লেখ করেছেন:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না, আর পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৬৬]

আর অহংকারের কারণে মানুষ হক্ব গ্রহণ করতে পারে না। যেমনটি পারেনি ফিরআউন ও তার দলের লোকেরা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

"তারা অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্যভরে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।"[৬৭]

সুতরাং একজন দা'ঈ যেহেতু সর্বদাই সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকবে, তাই সে কখনো অহংকারী হতে পারে না। বিনয়-নম্রতা হবে তার অন্যতম ভূষণ।

০৯. মানুষের সাথে মেলামেশা করা: মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের পক্ষে একাকী বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীর সকল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একই সমাজে মিলেমিশে বসবাস করে। আর মেলামেশা না করে একাকী জীবন-যাপন করলে কখনও দা'ওয়াত প্রদান করা সম্ভব হবে না। আর সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বাস করা যেমন সামাজিকতা বিরোধী, ঠিক তেমনি তা ধর্মবিরোধী। তাই একজন দা'ঈ তাঁর সমাজের সকল মানুষের সুখে-দুঃখে সাধ্যমত তাদের পাশে দাঁড়াবে। তাদের সাথে মিশবে, সফলতা ও মুক্তির মন্ত্র ইসলামের দা'ওয়াত তাদের নিকট উপস্থাপন করবে। আর তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে। নবী (ﷺ) বলেন:

---

৬৬. সূরা লুক্বমান ৩১ : ১৮।
৬৭. সূরা আন্ নামল ২৭ : ১৪।

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

যে মু'মিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে আর তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে সে ঐ মু'মিন ব্যক্তি থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিশেও না, তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণও করে না।[৬৮]

১০. মাদ'উ তথা আহুত ব্যক্তিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা: একজন দা'ঈকে তার সম্ভাব্য দাওয়াত গ্রহণকারী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। দাওয়াত প্রদানের পূর্বেই মাদ'উর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝতে হবে যে তাকে কীভাবে, কোন মেজাজে ও কখন দাওয়াত দেয়া ফলপ্রসূ হবে। তার মানসিক অবস্থাও অনুধাবন করা জরুরি। পরিবেশ বুঝে সময়োপযোগী কৌশলে দীনের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। মোটকথা, একজন দা'ঈকে দা'ওয়াতী কাজে অত্যন্ত সুকৌশলী ও অভিজ্ঞ হতে হবে।

১১. দা'ওয়াত হবে ইসলামের দিকে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

"তুমি প্রজ্ঞার সাথে এবং ভাল ভাল কথা দ্বারা তোমার রবের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করো, আর তাদের সাথে উত্তম কথার মাধ্যমে তর্কে লিপ্ত হও।"[৬৯]

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আজকে ইসলামের দা'ওয়াত সর্বজনীন না হয়ে তা হচ্ছে বিভিন্ন দল-উপদল, ফির্কা, ত্বরীকা, মাযহাব বা নিজস্ব মতবাদের দিকে। ফলে দা'ওয়াতের যে মূল উদ্দেশ্য মানব জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা তা আর হয়ে উঠছে না। একজন গুরবান কর্মী কখনো দলাদলিতে লিপ্ত হবে না বরং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে।

---

৬৮. সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৪০৩২, সহীহ।

৬৯. সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ১২৫।

তৃতীয় দফা

আত্ তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

(Organization and Managment)

ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা।

সংগঠন (Organaization) বলতে বিভিন্ন Organ বা অঙ্গকে একত্রিতকরণ, গ্রন্থায়ন, একীভূতকরণ বা আত্মীকরণ করা বুঝায়। সংগঠন বা Organaization মানবদেহের এই ভিন্ন ভিন্ন Organ গুলোর গ্রন্থায়ন ও একীভূতকরণের একটি জীবন্ত রূপ। মানবদেহের প্রতিটি সেল, প্রতিটি অনু পরমাণু একটা নিয়মের অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে স্ব-স্ব কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে। মানবদেহের একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা সুচারুরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহে প্রেরিত হয়। নির্দেশনা প্রাপ্তির পর কোন বিলম্ব ছাড়াই সেগুলো তা দ্রুত পালন করে। আর যদি সেগুলো তা পালন করতে অক্ষম হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই অঙ্গ অচল এবং ঐ দেহকে প্রতিবন্ধীও বলা যেতে পারে। মানবদেহের নির্দেশনার উৎপত্তি ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

নফস/অন্তর → হার্ট/হৃদপিণ্ড → Spinal cord → ব্রেইন/মগজ → অঙ্গ-প্রতঙ্গ।

এই দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া কত দ্রুত বাস্তবায়ন হয় তা সবার জানা। সে কারণেই মানবদেহ পৃথিবীতে সচল ও কর্মঠ এবং অতি আশ্চর্য প্রাণী হিসেবে বেঁচে আছে। আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর অভাব অভিযোগ বা অসুবিধা ইত্যাদির ব্যাপারে দেহরূপ এই সংগঠনের কেন্দ্র অর্থাৎ মন-মগজ দ্রুত অবহিত হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই একীভূতরূপের অনুকরণে কিছুসংখ্যক মানুষের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক দেহ এক প্রাণরূপে কাজ করার সামষ্টিক কাঠামোকেই বলা হয় সংগঠন বা Organaization। ইসলামের শাশ্বত সুমহান বার্তা দিশেহারা মানবজাতির নিকট ঐক্যবদ্ধভাবে ও সামষ্টিক উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় উপস্থাপনের আধুনিক অবকাঠামোগত পদ্ধতিই হচ্ছে সংগঠন। এই জন্যই নবী (ﷺ) মুসলিমদেরকে এক দেহের সাথে তুলনা করেছেন।

সংগঠন কাকে বলে?

Organization শব্দটি গ্রীক শব্দ Organon হতে নেয়া যার অর্থ অঙ্গ। সাধারণ অর্থে সংগঠন বলা হয়, যখন একদল মানুষ একত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাঙ্ক্ষিত কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক সাথে কাজ করে তখন তাকে সংগঠন বলে।[৭০] বর্তমান যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন রয়েছে। যেমন কোন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অবকাঠামো বা সরকার ব্যবস্থাও একটি সংগঠন। তেমনিভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ও অংশীদারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দল, সেচ্ছাসেবী এবং সমাজকল্যাণমুলক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সৈন্যবাহিনী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী সংগঠনঃ

নিখাঁদ তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদীর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের ওপর আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিবেদিত ও উৎসর্গিত মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসকে ইসলামী সংগঠন বলে।[৭১]

ব্যবস্থাপনা কী?

ব্যবস্থাপনা বা Management হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন সংস্থা বা সংগঠনের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ব্যবস্থাপনা হলো সেই প্রক্রিয়া, যা নিম্নবর্ণিত পাঁচটি কার্যের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল করে। যথা-

১. Planning বা পরিকল্পনা

২. Organaizing বা সংগঠিত করা

---

৬৯. *উইকিপিডিয়া।*

[৭১] *মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক*

৩. Leading বা নেতৃত্ব দেয়া

৪. Controling বা নিয়ন্ত্রন করা এবং

৫. Coordinating বা সমন্বয় সাধন।

ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন সংগঠন চলতে পারে না। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা একটি অপরটির পরিপূরক। সুতরাং, সংগঠনে ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝানো হয়, সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মীদের সুসংগঠিত করা, সেই কাজে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়া ও নিয়ন্ত্রণ করা। সর্বোপরি নেতা, কর্মী, পরিকল্পনা বা কর্মসূচি ও তা বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতির মাঝে সমন্বয় সাধন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করার নামই ব্যবস্থাপনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾

"আর তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামাত স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরে শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন।"[৭২]

আধুনিক যুগের অনেক প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এ কথার উপর ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, বর্তমান যুগে জাহিলিয়াত বিদূরিত করে একটি তাওহীদি সমাজ গড়তে ইসলামী সংগঠনের বিকল্প নেই। একাকী, বিচ্ছিন্নভাবে কোনদিনও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্যই দেশে দেশে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব সংগঠনের ব্যানারে

৭২. *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৩।*

মুসলিম স্কলারগণ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও সামষ্টিকভাবে তাওহীদ ও সুন্নাহর দা'ওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! তাছাড়া বর্তমান চতুর্মুখী ফিতনার আগ্রাসন হতে নিজেদের ঈমান সুরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ জীবন বা সাংগঠনিক অবকাঠামোর কোন বিকল্প নেই।

প্রচলিত ইসলামী সংগঠন : একটি বিশ্লেষণ

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাম্প্রতিককালের অধিকাংশ সংগঠনের কর্মসূচিতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নেই। কোনটি শুধু দা'ওয়াতী কাজের কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ, আবার কোনটি দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত, কোনটি আবার পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক পন্থায় ইকামতে দ্বীনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের কাজ করছে। সবারই প্রচেষ্টা দ্বীন ইসলামের ঝান্ডা আল্লাহর জমীনে বুলন্দ করা। তবে .... , আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে একটি বিষয় প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। আর তা হলো, বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলো মোটামুটি দুই ধরনের। যথা- ০১. দা'ওয়াতী সংগঠন, ০২. রাজনৈতিক সংগঠন।

আমার এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হলো এ দেশের দা'ওয়াতী সংগঠনগুলোর কর্মসূচিতে কোন রাজনৈতিক আদর্শ পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতির বাইরে থেকে তারা এমন কোন না কোন আদর্শকে সমর্থন করে থাকে, যা ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্থন করে না। তাদের দা'ওয়াতী কর্মসূচিতে 'আক্বীদাহ্-আদর্শের কোন কথাই উচ্চারিত হয় না। যা দু'একটি তাওহীদের কথা উচ্চারিত হয় তা তাওহীদের প্রাথমিক স্তর তথা তাওহীদুর রুবুবিয়াত, যা মক্কার মুশরিকরাও স্বীকার করত।

কিন্তু তাওহীদে রুবুবিয়্যাহর প্রকৃত দাবী হলো- তাওহীদে উলুহিয়্যাতের বাস্তবিক প্রয়োগ, যা তাদের নিকট মূখ্য নয়। বিষয়টি তারা একেবারেই এড়িয়ে যায়। এমনকি এ বিষয়টি সম্পর্কে পৃথিবীর সব দেশ ও অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলিম চরম উদাসীন ও অজ্ঞ। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, দা'ওয়াতী সংগঠনগুলোর কর্মসূচি শুধু অপূর্ণাঙ্গই নয় তা আবার ইসলামের মূল দর্শন থেকে কিছুটা বিচ্যুতও। দ্বিতীয় সমস্যা হলো- সেখানে মূর্খতার ছড়াছড়ি। একথা ঠিক যে, তাদের আন্তরিকতা ও

একনিষ্ঠতা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু, প্রকৃত ও প্রশস্ত জ্ঞানের উপস্থিতি কম বলে সেখানে গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও পৌত্তলিকতার পরিবেশ বিরাজিত। ফলে, সঠিক বিষয় উপস্থাপিত হলেও পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে তারা তা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়। প্রকৃত কথা হলো, দা'ওয়াতী সংগঠনগুলোকেই সবচাইতে বেশি উদার হতে হয়। একজন দা'ঈ, তিনি উদারতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সুতরাং সংকীর্ণতার উর্দ্ধে অবস্থান না করার কারণে এবং 'আক্বীদাহ্ ও আদর্শের সুস্পষ্ট রূপরেখা তাদের কর্মসূচিতে না থাকার কারণে ইসলামের প্রকৃতরূপের উপস্থাপন তাদের দ্বারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। মোটকথা, তাদের দা'ওয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মানহাজ অনুসারে হচ্ছে না। আবার ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো রাজনীতিকে এত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে যে, সেখানে তাওহীদ ও সুন্নাহ্র প্রতি দা'ওয়াতী কার্যক্রম প্রায় গৌণ হয়ে পড়েছে।

রাজনীতিকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহন বলে মনে করা হচ্ছে। এজন্য যেকোন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে তারা পিছপা হয় না। আমাদের খুব ভালভাবে মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম স্বীকৃত সকল বৈধ পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য। অবৈধ কোন পন্থা অবলম্বন অনুচিত এবং তা অকার্যকর। পরবর্তীতে তা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সহায়ক না হয়ে ধ্বংসাত্মকই হবে বটে। এখানেই অন্যান্য ধর্মের সাথে বা অপরাপর বস্তুবাদী আদর্শ ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য। বস্তুবাদ কিংবা সাম্রাজ্যবাদ তার নোংরা ও অন্তঃসারশূন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বৈধ-অবৈধ সকল পন্থা অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে কারো কোন ক্ষতি হলো কিনা তা তারা ভ্রূক্ষেপ করে না, ফলে নিজ দেশের বা জাতির স্বার্থ রক্ষার্থে তারা অন্য দেশ ও জাতির ওপর বোমা হামলা, ড্রোন, আত্মঘাতি হামলা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের কোন তোয়াক্কা তারা করে না। নিজের দেশের সকল নাগরিককে স্বাধীনতার সুযোগ দিয়ে তারা বলতে চায় যে, আমরা স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পক্ষে। কিন্তু পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলো আর মুক্তিকামী ও স্বাধীনতাকামী মানুষগুলো যখন নিজ ভূখণ্ডের স্বাধীনতার জন্য বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে, তখন তাদেরকে

সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়ে উল্টো নির্যাতন চালানো হচ্ছে, এ হলো সাম্রাজ্যবাদের ভয়াল রূপ। যেমনটি সাবার রাণী বুদ্ধিমতি 'বিলকিস' তার সভাসদদেরকে বলেছিল:

﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾

"রাণী বললেন, রাজাগণ কোন জনপদে ঢুকলে তাকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে।"[৭৩]

আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, ইসলামে দেশপ্রীতি যতটুকু তার চেয়ে ঢের বেশি মানবপ্রীতি, তা যে দেশেরই হোক না কেন। সুতরাং ইসলামের প্রীতি ও ভালবাসা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। নয় কোন বর্ণ, ভাষা বা বিশেষ জাতির সাথে, তা অবশ্যই বিশ্বজনীন (Universal)। সুতরাং একজন মুসলিম সাম্রাজ্যবাদীদের মতো আচরণ করতে পারে না, এটা ইসলামের আদর্শ নয়। ইসলামী দলগুলোর আরেকটা সমস্যা হলো সমন্বয়হীনতা। আর এর কারণ হলো, আদর্শিক মত-পার্থক্য। এমনকি বিভিন্ন দেশে ইসলামী গ্রুপগুলো একে অপরকে কাফির পর্যন্ত আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আর এই মত-পার্থক্যের কারণ হলো ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অন্ধ অনুকরণ বা তাকলীদ্। কুরআন ও হাদীসের অমোঘ বাণীকে নিঃশর্তভাবে মেনে না নেয়ার কারণে এবং নিজ দলের বা কোন ব্যক্তির উদ্ভাবিত আদর্শকে ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলে দাবী ও প্রচারের প্রয়াস। আর এর ফলে এই মত-বিরোধ দিন দিন বেড়েই চলছে। এমনকি নিজেদের কারখানায় উদ্ভাবিত আদর্শকে ইসলাম বলে প্রচারের কারণে সাধারণ মানুষ সেটাকেই ইসলাম বলে মনে করছে এবং তাদের মাঝেও মত-বিরোধ বেড়েই চলছে।

উপর্যুক্ত দুই ধরনের সংগঠন তথা দা'ওয়াতী সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মৌলিক সমস্যা হলো গোঁড়ামী ও কুরআন-হাদীসকে ব্যক্তি ও নিজ নিজ দলীয় আদর্শের উপরে স্থান না দেয়া। এই একটি সমস্যাই হাজারো সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

---

৭৩. সূরা আন্ নাম্ল ২৭ : ৩৩।

বক্ষমান অংশে বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনগুলোর মৌলিক যে সমস্যা দু'টি আমরা আলোচনা করলাম তা হলো-

০১. আদর্শের অপূর্ণাঙ্গতা

০২. আদর্শ গ্রহণের উৎসের ভিন্নতার ফলে মৌলিক আদর্শের বিচ্যুতি।

জমঈয়ত শুব্বানে আহ্‌লে হাদীস বাংলাদেশ এই উভয় সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং পূর্বসূরিদের মানহাজ তথা আদর্শকে লালন করে ও প্রচার করে। এই খালেস বিশ্বাসের আলোকেই এদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শিক ইসলামী সংগঠন হিসাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে চায়।

এতক্ষণ ধরে আমরা বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনগুলোর মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। সেই প্রেক্ষিতে শুব্বানের সাংগঠনিক আদর্শকে আল্লাহর রহমতে এক কথায় প্রকাশও করতে সক্ষম হয়েছি। ফালিল্লাহিল হামদ্!

আদর্শ সংগঠনের রূপরেখা:

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো— সাংগঠনিক অবকাঠামো বা সংঘবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রতিটি কর্মীর জন্য আবশ্যক। আর সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও আদর্শকে নিজের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে না পারলে তাকে আদর্শ কর্মী বলা যায় না। বিশেষত শুব্বানের কোন কর্মী তার নিজ সংগঠনের সর্বজনীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সুচিন্তিত এবং বাস্তবসম্মত কর্মসূচি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। এর মৌলিক ইসলামী আদর্শের সাথে সামান্য দ্বিমত পোষণ করলে সে আর যাই হোক, আদর্শ শুব্বান কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ শুব্বানের আদর্শ কুরআন-সুন্নাহ্‌র শাশ্বত ও সর্বজনীন মৌলিক আদর্শ। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে নবী (ﷺ)-এর আনীত জীবন-বিধানের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও রূপরেখা।

সুতরাং একজন শুব্বান দায়িত্বশীল বা কর্মী তার উপর অর্পিত কোন দায়িত্ব পালনে কখনোই অবহেলা করবে না বরং সেই দায়িত্বকে শুধুমাত্র সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসেবে নয়, বরং ঈমানী দায়িত্ব হিসেবেই পালন করবে। আর সেই সাথে শুব্বানকে শুধুমাত্র একটি অবকাঠামোগত সংগঠন মনে না করে বরং একটি সর্বজনীন ইসলামী আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী ও ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা প্রদানকারী সম্মিলিত চিন্তা ও প্রচেষ্টার প্লাটফর্ম মনে করতে হবে। জীবনের চেয়েও ঈমানের দাম যেমন অনেক বেশি, তেমনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও কর্মসূচি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী সংগঠনের প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে আরো বেশি কর্মতৎপর হতে হবে। মুসলিম স্কলারগণ আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব ও নতুনত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটাতে পারলে পৃথিবীর গতিপথ আবারো নতুন করে পাল্টানো সম্ভব হবে। এজন্য ঈমানী চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা ও চিন্তাজগতের বিপ্লব সাধন আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সংগঠনের মৌলিক উপাদান:

এবার আমরা আলোচনা করব একটি সংগঠনের অবকাঠামোগত দিক নিয়ে। সংগঠনের মৌলিক উপাদান ৪টি। যথা—

১. নেতা বা নেতৃত্ব
২. কর্মী ও আনুগত্য
৩. কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি
৪. শূরা বা পরামর্শ।

উক্ত চারটি উপাদানের মাধ্যমে একটি সংগঠন তার কাঠামোগত রূপ লাভ করে। এর কোন একটি উপাদান না থাকলে সেটা আর সংগঠন থাকে না, আর কোন একটি উপাদান দুর্বল হলে সেটা সুসংগঠিত সংগঠন হয় না।

০১. নেতা ও নেতৃত্ব:

নেতা ছাড়া সংগঠন হয় না। সুখ-দুঃখ, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, প্রতিকূল পরিবেশে দিকপাল হিসেবে যিনি দলকে সামনে এগিয়ে নেন তাকেই নেতা বলে। যোগ্য ও স্বার্থত্যাগী নেতাই প্রকৃত নেতা। এখানে নেতার ছোট্ট আর

একটি পরিচয় দেয়া ভাল মনে করছি। নেতা হলেন তিনি, যিনি বিপদের সময় কর্মীর পাশে এসে দাঁড়ান, তার ব্যক্তিগত খোঁজখবর রাখেন, কর্মীর সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেন। সাধ্যমতো সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনে নিজের স্বার্থকে অকাতরে বিলিয়ে দেন।

নেতৃত্ব এমন একটি গুণ, যা মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে। আবার অনেকে পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও সে গুণাবলি অর্জন করে থাকে। অত্যন্ত গোপনীয় অথচ বাস্তব বিষয় হলো-কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাবার উচ্চাকাঙ্খা (Ambition) ছাড়া মানুষ নেতা হতে পারে না। সুতরাং উচ্চাশা কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে নেতৃত্বের দিকে ঠেলে দিবে। এ ছাড়া নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সমাজকে বদলে দেয়ার প্রবল ইচ্ছা যাদের মনে কাজ করে, তারাও ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেয়। ক্ষণজন্মা অনেক রাজনীতিবীদের মাঝেও এমন গুণ লক্ষ করা যায়, যারা শৈশব-যৌবনেই স্বপ্ন দেখেছেন দেশ ও সমাজকে বদলে দেবার। সমাজের নানা ঘটনা তাদের হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল। তাই সংকল্প নিয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য এনেছেন। তবে আজকালের স্ব- ঘোষিত নেতাদের মাঝে সততা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতা না থাকায় সমাজ ও দেশের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং ইসলামী সংগঠনের একজন নেতাকে স্বপ্ন নিয়েই বড় হতে হবে। জাতির কল্যাণে নিবেদিত হবার সাহসিকতা লালন করতে হবে। মীর নিসার আলী তিতুমীর, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সানাউল্লাহ অমৃতসরীর (রহ.) বিপ্লবী পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তাদের আদর্শে উজ্জীবিত হতে হবে। সেইসাথে সত্য ও ন্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নৈতিকতার মানদণ্ডে থাকতে হবে অবিচল। এটা নেতার সর্বোত্তম গুণ।

নেতৃত্বের গুণাবলিঃ

(০১) জ্ঞানের পরিপক্কতা ও

(০২) শারীরিক সক্ষমতা

তালূতকে যখন আল্লাহ তার দেশের রাজা নির্বাচন করলেন, তখন দেশের জনগণ প্রশ্ন করল যে, তিনি কীভাবে আমাদের রাজা হতে পারেন অথচ তার সম্পদের প্রাচুর্য নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাব দিলেনঃ

﴿ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

"জনগণ বলল: সে (তালুত) কীভাবে আমাদের রাজা হতে পারে? আমরাই তো তার চেয়ে রাজা হবার বেশি হক্বদার। তারতো সম্পদের প্রাচুর্যতাও নেই। নবী বললেন: আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং (প্রাচুর্য না থাকলেও) জ্ঞান ও দেহের দিক দিয়ে আল্লাহ তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা তাকেই দেন। তিনি প্রসস্ত মহাজ্ঞানী।"[৭৪]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানের কারণে মূসা ('আলায়হিস্ সালাম)-এর মতো জলীলুল ক্বদর নবীকেও খিযির ('আলায়হিস্ সালাম)-এর অনুসরণ করতে হয়েছিল। সুতরাং জ্ঞানীরাই নেতৃত্বের আসন পাওয়ার অধিক হক্বদার। সমাজ বিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনু খালদুন (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে একজন নেতার জন্য চারটি গুণাবলি থাকা আবশ্যক। তিনি বলেন:

وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل.

আর এই পদ* মর্যাদার জন্য শর্ত হলো চারটি। সেগুলো হলো-

১. জ্ঞান;

২. ন্যায়পরায়ণতা;

---

৭৪ সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৪৭।

* এখানে পদ বলতে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানকেই উদ্দেশ্য করেছেন। যেহেতু ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিধি-ব্যবস্থা চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আর ইসলামী সংগঠনের একজন নেতা অদূর ভবিষ্যতে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের নেতাও হতে পারেন। সেহেতু তার মধ্যেও ঐ চারটি অপরিহার্য গুণের সমাবেশ ঘটানো একান্ত জরুরি। এমনকি তা একটি ইসলামী সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার জন্য পূর্বশর্তও বটে।

৩. ইসলামী বিধি-বিধান ও বিচার-ব্যবস্থা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা;

৪. এবং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা, যার মাধ্যমে তার চিন্তা ও কর্মে সুপ্রভাব প্রতিফলিত হবে।

"উক্ত চারটি শর্তের ব্যাখ্যায় তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করে বলেন, প্রথম শর্ত 'ইল্‌ম বা জ্ঞানের বিষয়টি তো স্পষ্ট। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামের বিভিন্ন বিধান, বিচার-আচার ও শাস্তিসমূহ বাস্তবায়ন করবেন। সুতরাং তার জ্ঞানী হওয়া অপরিহার্য। আর তাকলীদ বা অপরের অনুসরণ মানবীয় গুণে অপূর্ণাঙ্গতার পরিচয় বহন করে। ইসলামী নেতৃত্বে মানবীয় কোন গুণাবলির অনুপস্থিতি বা অপূর্ণাঙ্গতা দূষণীয়। তাই রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফাকে অবশ্যই জ্ঞানী হওয়া চাই।"

ইসলামী সংগঠন যেহেতু আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রাথমিক ধাপ, তাই ইসলামী সংগঠনের একজন নেতাকেও জ্ঞানী, দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া একান্ত জরুরি।

ন্যায়পরায়ণতার ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু খালদুন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যেহেতু এটা একটা ধর্মীয় পদ, তাই এখানে ন্যায়পরায়ণতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। বাহ্যিকভাবে কোন নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে 'আদালত বা ন্যায়পরায়ণতার গুণ তার মধ্যে অনুপস্থিত আছে বলে সকল বিদ্বানগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন।"

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যেমনিভাবে দেশের বিচার, প্রশাসন, প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত ও সেনাবাহিনী প্রস্তুতকরণসহ সরকারি ভাতা প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং দেশের যেকোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি ও বংশপ্রীতিকে আশ্রয় প্রদান করবেন না ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী সংগঠনের একজন নেতাও তার সংগঠনের প্রত্যেক স্তরের কর্মীর সাথে সামান্যতম কোন স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিবেন না। স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিলে সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভঙ্গুর হয়ে পড়বে, বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হবে, কর্মীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও মনোমালিন্যের ব্যাধি সৃষ্টি হবে, যা ইসলামী সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

পরিচালন দক্ষতার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, পরিচালন দক্ষতা বলতে বুঝায় তার (নেতার) ক্ষমতার এমন প্রভাব, যাতে করে দেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো ও বিচার-ব্যবস্থা এবং সংঘটিত অপরাধের শাস্তি বাস্তবায়নে ও শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা যুদ্ধে দেশের মানুষের জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা জনগণের মাঝে সর্বদাই জাগরুক থাকে। তিনি শরী'আহ্ অনুমোদিত ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয় এমন যেকোন সিদ্ধান্ত দিলে তার সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মচারীসহ আপামর জনতা সেই নির্দেশনাকে বাস্তবায়ন করে। আর তা করে শুধুমাত্র তার ভয়ে নয় বরং তাকে শ্রদ্ধা করে ও তার উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রভাবে।

চতুর্থ শর্ত তথা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন তার মধ্যে পাগলামী ভাব না থাকা। নির্বোধ শ্রেণির লোকেরা এই মহান দায়িত্বের ভার নিতে পারে না। একইভাবে অন্ধ, বধির, বোবা ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিরাও এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে পারে না।

বি: দ্র: আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য মুকাদ্দিমার ১ম খণ্ডের ১৬তম অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

(০৩) উন্নত আমল

(০৪) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি

(০৫) সত্যনিষ্ঠতা

(০৬) আমানতদারিতা

(০৭) সূক্ষ্মদর্শিতা

(০৮) দূরদর্শিতা

এসকল গুণে গুণান্বিত হয়ে একজন নেতা অন্য সকলের চেয়ে একটু আলাদা এবং উন্নত চরিত্র ও চিন্তার অধিকারী হবেন। তাকে দেখেই যেন পুত:পবিত্র একটি মানুষের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। অর্থাৎ, তাকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক থেকে উত্তম আদর্শের মানুষ হতে হবে। সেইসাথে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতে এর ফলাফল কী হবে তা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো যোগ্য হবেন। আবার বিপদের সময় বা জরুরি অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে এত বিলম্ব করবেন না যে, সংগঠনের বা কোন কর্মীর ক্ষতি হয়।

(০৯) উদারতা: একজন নেতাকে জমিনের মতো উদার হতে হয়। জমিনের বুকে মানুষ কত অন্যায়, অত্যাচার করে। জমিন নিরবে তা সহ্য করে যায়, মুখ বুজে সয়ে যায়। একজন নেতা তার কর্মী বাহিনীর প্রতি সদয় ও উদারচিত্ত হবেন যেন কর্মীরা সেখানে নির্ভরতার স্থান খুঁজে পায়, সাংগঠনিক কোন ত্রুটিকে কেন্দ্র করে কিংবা ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগলে কোন কর্মীর প্রতি চড়াও হওয়া কিংবা পরবর্তীতে কোন কর্মীর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের গোপন ইচ্ছা পোষণ করা কোন যোগ্য নেতার স্বভাব হতে পারে না। এতে সংগঠনের সৌন্দর্য নষ্ট হয়, ভিত দুর্বল হয়, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ সৃষ্টি হয়, স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় এবং সংগঠন উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। (আমরা যেমন ব্যক্তিপূজা করি না তেমনি কাউকে হেয়-ছোট করে দেখার মানসিকতাও পোষণ করি না)

উদারতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নবীর জীবন থেকে পেশ করা সমীচীন মনে করছি। একদা এক বেদুঈন জনসম্মুখে নবী (ﷺ)-এর পিছন থেকে তার চাদর নিয়ে এমনভাবে টান দিলো যে, গলায় সেটার দাগ পড়ে গেল। এরপর সে বলল: হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমাকে গনীমতের সম্পদ দাও। নবী (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর গনীমতের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীকে সম্পদ দিতে নির্দেশ করলেন (তার প্রতি সামান্য রাগও করলেন না)।[৭৫]

এ হলো নবী (ﷺ)-এর উদারতা, তার বিশাল হৃদয়ের ও মহোত্তম আদর্শের একটিমাত্র উদাহরণ। এ ধরনের উদাহরণ নবী জীবনের পরতে পরতে ঐতিহাসিক প্রমাণ আর আদর্শের প্রতীক হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ জন্যই তিনি বিশ্বনবী, জনদরদী বিশ্বনেতা রহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন।

সংগঠনের যেকোন স্তরের কর্মী কোন ভুল করলে সেটাকে ইস্যু বানিয়ে প্রচার করে তাকে হেনস্তা করা কোন নেতার কাজ নয় তার। কাজ হলো সেটাকে গোপনে সংশোধন করানো।

(১০) দৃঢ়তা: আবু বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)-এর খিলাফতকালের গোড়ার দিকে 'উসামাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া

---

৭৫. সহীহুল বুখারী- ৫৭৩৮।

অভিযানের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্নজন প্রশ্ন তুললেন। তিনি বয়সে কম, বড় বড় সাহাবীরা এখানে উপস্থিত, খিলাফতের এই সংকটকালে বহির্বিশ্বে অভিযান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আবু বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাইতো তিনি সবার মতামতকে উপেক্ষা করে বললেনঃ নবী (ﷺ) নিজেই যে বাহিনীকে প্রস্তুত করেছেন আমি তাকে বসিয়ে রাখতে পারি না। আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার বাহিনীকে প্রেরণ করলেন।

অন্যের কথার উপর সর্বদাই নির্ভর করা কোন আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য নয়। দৃঢ়তা তার অন্যতম গুণ হওয়া চাই।

(১১) আত্মত্যাগ

(১২) স্বার্থত্যাগ

অন্যের উপকার বা সংগঠনের উন্নতিকল্পে নিজের সময়, শ্রম বা অর্থ ব্যয় করার নাম অত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ। ব্যক্তি উন্নতির জন্য যা করা হয় তাকে আত্মত্যাগ বলতে আমার অত্যুক্তি মনে হয়। উপর্যুক্ত নেতৃত্বের গুণাবলির সমন্বয়েই একজন কর্মী আদর্শ নেতায় পরিণত হতে পারেন। গড়ে যেতে পারেন হাজারো কর্মী ও অনুসারী।

০২. কর্মী ও আনুগত্যঃ

ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান কর্মী সংগঠনের প্রাণ। কর্মী তাকেই বলে, যে নেতার বৈধ যেকোন নির্দেশ পালনের জন্য জীবন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর জন্য সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে। কেন্দ্রের যেকোন নির্দেশ শাখাগুলো যথোপযুক্তভাবে পালন করে। নেতা ও কর্মীর উপর্যুক্ত দু'টি গুণ আজ ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত বলে মুসলিমদের এই নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি দুর্বল হওয়াই এর মূল কারণ। সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ভালবাসা না থাকলে কর্মী যতই কর্মঠ হোকনা কেন, তার দ্বারা উপকারের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যেকোন সংগঠনের চালিকা শক্তি হলো সেই সংগঠনের কর্মীবাহিনী। আরো ভালভাবে বলা যায় যে, যে সংগঠনের কর্মী বাহিনী যত বেশী প্রশিক্ষিত, আদর্শ সম্পর্কে সচেতন, নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এবং চারিত্রিকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত সেই সংগঠন তত বেশী শক্তিশালী। একদল যোগ্য, দক্ষ, ত্যাগী, জানবাজ কর্মীবাহিনী যেকোন সংগঠনের প্রাণশক্তি, যারা সর্বদাই সংগঠনের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ থেকে বড় করে দেখবে, সংগঠনের সকল দায়িত্বকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে পালন করবে। অজুহাত পেশ করা কোন আদর্শ কর্মীর বৈশিষ্ট্য নয়। একথা মনে রাখতে হবে, আজকের কর্মী আগামী দিনের নেতা।

সুতরাং কর্মী হিসেবে আমি কতটুকু আনুগত্য করলাম আর আমার দায়িত্ব কীভাবে পালন করলাম সেটাই বিবেচ্য বিষয়। কারণ আমি নেতা হলে আমার কর্মীরাও আমার সাথে সেরূপ আচরণ করবে। আমার কর্মীদের নিকট থেকে আমি যে ধরনের আচরণ আশা করি, সেই ধরণের আচরণ আমি আমার নেতার সাথে করব— এটাই একজন আদর্শ কর্মীর বৈশিষ্ট্য। এবার আমরা ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীর সাধারণ বৈশিষ্টাবলির কিছু উল্লেখ করব।

(০১) আনুগত্যঃ নেতৃত্বের প্রতি সর্বদাই আনুগত্য প্রকাশ করা একজন কর্মীর প্রথম ও প্রধান শর্ত। এই আনুগত্যের ব্যাপারটি আমাদের নিকট মামুলি ধরনের মনে হয়, গুরুত্বহীন বলে মনে করি আমরা। (বিশেষতঃ আহ্‌লে হাদীস সমাজে এ বিশৃঙ্খলা বেশি দেখা যায়।) যে কোন সংগঠনের জন্য আনুগত্যের বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়। কারণ আনুগত্য ছাড়া সংগঠন চলতে পারে না। বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়ে যায়। সংগঠন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়। এ জন্যই আনুগত্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা তালুতের মাধ্যমে তার সৈন্যদলকে পরীক্ষা করলেন কে অনুগত, আর কে অবাধ্য। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ
مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾

"যখন তালূত সৈন্যদলসহ বহির্গত হয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন, অতঃপর তা হতে যে পান করবে সে কিন্তু আমার দলভুক্ত থাকবে না তবে যে স্বীয় হাত দ্বারা আজলাপূর্ণ করে নেয় সে ব্যতীত। আর যে তা আস্বাদন করবে না সে আমার দলভুক্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প লোক ব্যতীত সকলেই সেই নদীর পানি পান করল।"[৭৬]

ফলে তারা তার দল থেকে বহিষ্কৃত হলো, এখানে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, সৈন্যদের এ প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না যে, কেন আমরা নদীর পানি পান করতে পারি না? এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে, অনেক সময় সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে কিংবা নেতার আদেশের পুরো মর্মার্থ না বুঝেই আপনাকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, এটা একজন আদর্শ কর্মীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(০২) নেতার জন্য প্রয়োজনে জীবন বাজি রাখা: আপনি ইতিহাস থেকে উহুদের অধ্যায় পড়ুন। নবী (ﷺ)-এর জন্য ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) কীভাবে জীবন বাজি রেখেছিলেন। একজন নেতার প্রতি তার কর্মীর কী করা উচিত—এর থেকে ত্যাগের ইতিহাস আর আমার জানা নেই।

(০৩) নেতার সামনে উচ্চঃস্বরে কথা না বলা: (আপনি সূরা আল হুজুরা-ত-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত পড়ুন। দেখুন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা কী?

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবী (ﷺ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চঃস্বরে কথা বলো তার সাথে সেইরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে।"[৭৭]

---

৭৬. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৪৯।

৭৭. সূরা আল হুজুরা-ত ৪৯: ২।

নির্ভরযোগ্য তাফসীর মতে, এই আয়াতের মুখাতাব বা সম্মোধিত ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)। আবু বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)-এর মতো কর্মীদ্বয়কে তাদের নেতার সামনে কী ধরনের আচরণ করতে হবে ও তাদের কণ্ঠস্বর এখানে কতটুকু উঁচু হবে তা আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিলেন। আমরাও এই আয়াত থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে, একজন কর্মী তার নেতার সামনে কীভাবে কথা বলবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)-এর কণ্ঠস্বর এত নিচু হয়ে গিয়েছিল যে, নবী (ﷺ) তাকে একটি কথা তিনবার জিজ্ঞেস করে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) কী বলছেন।

(০৪) পদবঞ্চিত হলেও মনোক্ষুণ্ন না হয়ে আনুগত্য বহাল রাখা: আপনারা ইসলামের জাতীয় বীর সাহাবা খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে নিশ্চয়ই চিনেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) তাকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করে একজন সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দিলেন। অন্যান্য সৈনিকরা বলল যে, আপনাকে এভাবে লাঞ্ছিত করা হলো আর আপনি এখনো যুদ্ধ করেই যাচ্ছেন? অকুতোভয় মহাবীর খালিদ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) বললেন: আমি তো 'উমারের জন্য যুদ্ধ করি না, আমি যুদ্ধ করি আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা কতটুকু সেটাই বিবেচ্য। দুনিয়াতে কোন পদ আমি পেলাম কি না এতে আমি মোটেও চিন্তিত নই। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা আর কাকে বলে?

(০৫) সাংগঠনিক কাজে সদা তৎপর থাকা: একজন কর্মী তার চলনে-বলনে, পরিবারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে সব জায়গায় সর্বদাই সংগঠন নিয়ে চিন্তা করবে এবং এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কীভাবে করা যায় সে চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। আর যে কোন সুযোগ কাজে লাগাবে, শুধু নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিক প্রোগামে উপস্থিত হওয়া কোন আদর্শ কর্মীর বৈশিষ্ট্য নয়। শুধু মৌসুমী বক্তব্য বা মৌসুমী প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়াও একজন আদর্শ কর্মীর বৈশিষ্ট্য নয়।

সারকথা হলো সাংগঠনিক দায়িত্বকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে সে সম্পর্কে সর্বদাই তৎপর থাকা যে কোন আদর্শ কর্মীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, প্রত্যেক কর্মীর স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সাংগঠনিক কর্মতৎপরতাই কেন্দ্র বা মূল সংগঠনকে শক্তিশালী করে, নেতৃবৃন্দ আশান্বিত হন। নেতা-কর্মীর উল্লিখিত কয়েকটি গুণ আপাতদৃষ্টিতে আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এর বাইরেও অনেক গুণ আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। সফল নেতা ও কর্মীর শর্তাবলি ও গুণাবলি বর্ণনায় পৃথক একটি গ্রন্থের দাবী রাখে। (সাংগঠনিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে কলম ধরলে আমরা আরো উপকৃত হবো।)

০৩. কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি:

অভীষ্ট গন্তব্যে পৌছতে হলে চাই সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি। অনির্দিষ্ট কর্মসূচি দ্বারা লক্ষ্যপানে পৌছা অসম্ভব। একটি আদর্শ সংগঠনের বাস্তবধর্মী কর্মসূচি নিয়েই শুব্বান এগিয়ে যাবার প্রত্যয় গ্রহণ করেছে। আর সে কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী কর্মপদ্ধতি। সময়ের সাথে প্রত্যেক কর্মীই যাতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, সেই উন্নতমানের কর্মপদ্ধতি ইসলামী সংগঠনে থাকা একান্ত জরুরি। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করতে না পারলে কর্মীদের যে খেসারত দিতে হয় তা সংগঠনমনা কারও অজানা নয়।

কর্মপদ্ধতি হলো কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি। সুতরাং তা হওয়া চাই যুগোপযোগী, বাস্তবধর্মী ও পরিবর্তনশীল।

বিশ বছর পূর্বে আমাদের ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি আর এখনকার পদ্ধতির মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যুগের চাহিদার সাথে আমাদের কর্মপদ্ধতির যোগসূত্র ঘটাতে না পারলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে। আধুনিককালে উদ্ভাবিত সকল যোগাযোগ মাধ্যমকে সঠিকভাবে ও পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে না পারলে ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট আমাদের দা'ওয়াত পৌছানো বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সম্মুখীন হয়ে আমার তা মনে হয়েছে। আশাকরি আপনিও একমত হবেন। তবে এর সমাধান খুব তাড়াতাড়ি হবে এবং খুব ভালভাবেই হবে যদি আমার কর্মী ভাইদের কর্মচাঞ্চল্য সেই উদ্দেশ্যকে খেয়াল রেখে সর্বদা অব্যাহত থাকে।

শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী প্রয়োজন, সেই কর্মীবাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া আমাদের কর্মপদ্ধতির মাঝেই নিহিত রয়েছে। এতে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন কর্মী এটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিপালন করতে পারলে নিজেকে একজন যোগ্য কর্মী হিসেবে গঠন করতে সক্ষম হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং একজন শুব্বান কর্মীকে অবশ্যই শুব্বানের কর্মপদ্ধতি খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে।

০৪. শূরা বা পরামর্শ:

যেকোন পরিসরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শের বিকল্প নেই। পরামর্শহীন কোন সিদ্ধান্ত অন্তসারশূন্য বলে মনে হয় এবং তা বাস্তবায়নের ফলাফলও অসন্তোষজনক হয়ে থাকে। আর ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা সংগঠনের বেলায় শূরা আরো বেশি জরুরি। 'শূরা' বা পরামর্শ হলো ইসলামের সৌন্দর্য ও সৌকর্য। শূরা সমাজ, রাষ্ট্র বা সংগঠনের মেধাবী নেতৃত্বের মূল্যায়নের মানদণ্ড। পরামর্শ পদ্ধতি সংগঠনের কর্মীদের মাঝে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। নবী (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশনায় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে ও নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। পরামর্শ না করলে সমাজ ও সংগঠনে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় আর রাষ্ট্রে জন্ম লাভ করে ফ্যাসিবাদ। পরামর্শ নেয়া ও পরামর্শ দেয়া এবং পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইসলামী সংগঠনের অন্যতম উপাদান। পরামর্শের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله

"আর সর্ববিষয়ে (কিংবা উদ্দিষ্ট বিষয়ে) তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর (পরামর্শের ভিত্তিতে) কোন বিষয়ে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গেলে আল্লাহর ওপর ভরসা কর।"[৭৮]

[৭৮] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯

আর মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা পারস্পরিক কাজকর্ম পরামর্শভিত্তিক করে থাকে। সুতরাং সংগঠনের সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ করার অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। এমন অনেক ভূঁইফোঁড় সংগঠন ও দল রয়েছে, যা এক বা দুইজনের কথায়ই পরিচালিত হয়। ইসলামী সংগঠনের আদর্শ কখনো এমনটা হতে পারে না। ছোট কিংবা বড় যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ করা উচিত। যদি সে বিষয়টি ঠুনকোও হয় কিংবা পরামর্শ প্রদানকারীগণ বিজ্ঞ না হন তারপরও পরামর্শ করা উচিত। এ বিষয়টির চর্চা আসলে আমাদের পরিবার থেকেই শুরু করা দরকার। তাহলে পারিবারিকভাবেই সকল মানুষের মাঝে অভ্যাসটি গড়ে উঠবে। তবে অপরিহার্যভাবে তা ইসলামী সংগঠনে অনুশীলন করা জরুরি।

চতুর্থ দফা

আত্-তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

(Learning and Training)

একটি ইসলামী সংগঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— সেই সংগঠনের কর্মীবাহিনী শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রণী হবে। কৌতুহলী হয়ে নিজে শিখবে, চর্চা করবে এবং অন্যকে শেখাবে। জ্ঞানের জগতে উজ্জল তারকা হয়ে তারা অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অপসংস্কৃতির করাল অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হবে। কুসংস্কার, অসভ্যতা ও ভ্রান্তির কালোজাল ছিন্ন করে আলোর দিশারী হয়ে অন্ধকারে পথ দেখাবে। এর নামই তারবিয়াহ বা শিক্ষণ।

সাধারণ অর্থে প্রশিক্ষণ বলতে কারিগরি বা বিশেষ কোন বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাকে বুঝায়। আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বেলায় প্রশিক্ষণ হলো নিজেকে যোগ্য করে তোলার সেই প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন কর্মী বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ এবং দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পরিপূর্ণ ঈমানে বলীয়ান হতে পারে। কর্মীরা যেন সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি যথাযথভাবে আত্মস্থ করে সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির আলোকে যুগোপযোগী কর্মপন্থায় দাওয়াতী, সাংগঠনিক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে চৌকস সৈন্যবাহিনীর অন্যতম সদস্য বানাতে পারে। চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ শেষে

প্রত্যেক কর্মী যেন সেই বাহিনীকে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাপূর্ণভাবে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়ার সাহসী চেতনা লালন করে। এটাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। সুতরাং সংগঠনের কর্মীদের প্রশিক্ষিত হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

তারা প্রশিক্ষিত হবে ইসলামের 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসে, তাহযীব-তামাদ্দুনে এবং যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে। আধুনিকতার প্রতি ইসলামের দাবি কী? অথবা ইসলাম আধুনিক এ যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কি না সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তা সমাজে ও দেশে প্রয়োগের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও একজন আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব। আবার কর্মীবাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়াও একটি আদর্শ সংগঠনের দায়িত্ব।

সংগঠনের একজন কর্মীকে একাধারে সেরা বাগ্মী, সেরা বিতার্কিক, সেরা দা'ঈ, সেরা শিক্ষক, সেরা প্রশিক্ষক, সেরা অধ্যাপক, শ্রেষ্ঠ গবেষক, শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ-অভিধানবিদ, সেরা লেখক, সেরা উপস্থাপক, সেরা ব্যবস্থাপক হতে হবে। অন্ততপক্ষে এগুলো হওয়ার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হবে এবং সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। সেইসাথে নিত্য-নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে এবং ব্যবহার-বিধি জানতে হবে। পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়েও দখল থাকতে হবে।

প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন কর্মীই নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করতে পারে না। আবার প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে গাফলতি করে কোন সংগঠনও নিজেকে সফল সংগঠন হিসেবে দাবি করতে পারে না। নিজকে উপযুক্ত (Perfect) হিসেবে প্রমাণ করার জন্য একজন সৈনিককে যে কত ধরনের শারীরিক কসরত করতে হয়, কত দুর্গম স্থানকে নিজের জন্য সুগম করে নিতে হয়, আবার প্রশিক্ষণের সময় সামান্য ভুলের জন্য যে কত শাস্তি পেতে হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। স্বর্ণ না পোড়ালে তা খাঁটি হয় না, নিষ্কলুষ হয় না, খাদ থেকেই যায়। জমিন চাষযোগ্য করার জন্য নির্দয়ভাবে তার বুকে লাঙ্গলের ফলা ঢুকিয়ে দেয়া হয়, কর্ষণ করা হয় জমিনকে, আগাছা সাফ করা হয়। কারণ আগাছা সাফ না করলে সেই জমিনে যে বীজ বপন করা হবে তা আগাছার কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। ময়লাযুক্ত কাপড় গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়, আছাড় দিয়ে ধুতে হয়, তারপর সেটাকে রোদে পুড়ে শুকাতে হয়, বিদ্যুতের তাপ দিতে হয় তবেই তা ব্যবহারযোগ্য হয়। পরিধানকারীর মেজাজ ফুরফুরে থাকে, মনে

প্রশান্তি লাভ করে। একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে উপযুক্ত বা ব্যবহারযোগ্য করার এই যে দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া সেটাকেই সংগঠনের ভাষায় প্রশিক্ষণ (Training) বা তাদরীব নামে অভিহিত করা হয়।

নবী (ﷺ) নিজেও সাহাবায়ে কিরামকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ঈমানী চেতনায় বলীয়ান করেছিলেন। পারলৌকিক দিক বিবেচনায় তারা যে তুলনাহীন ছিলেন এ ব্যাপারে কারো অজানা নয়। অজানার বিষয় হলো- সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হুম) তাদের যুগে সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল ছিলেন, যুগের চাহিদা পূরণে তারা সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। সামরিকভাবে তারা সে যুগের সফল একটি সৈন্যবাহিনী হিসেবে সারা বিশ্বে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। আমরা তো এ কথাও জানি যে, যুদ্ধের কৌশল হিসাবে তারা এমন সব অস্ত্র আবিষ্কার ও বুদ্ধি এঁটেছিলেন, যা সে যুগের পরাশক্তিগুলোকে হতচকিত করে দিয়েছিল। যেমন- ৫ম হিজরীতে আহযাবের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর যৌথ হামলা (Battle of confedaretion)-কে রুখে দেয়ার জন্য সাহাবী সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)-এর পরামর্শে পরিখা খনন, যুদ্ধে মিনযানিক (বিশেষ ধরনের ক্ষেপনাস্ত্র) এর ব্যবহার, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু)-এর মুতার যুদ্ধে গৃহীত কৌশল, যেগুলো যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ঈমানের চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ ও প্রবল ধৈর্যের কারণেই খাব্বাব, খুবাইব, ইয়াসার ও সুমাইয়া (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হুম) মৃত্যুমুখেও সামান্য বিচলিত হননি, শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন হাসি মুখে। এই প্রশিক্ষণই মুসলিমদেরকে বিশ্বে পরিচিত করে দিয়েছিল একটি সুশিক্ষিত, সভ্য, সুশৃঙ্খল, শক্তিমান ও স্বনির্ভর জাতি হিসেবে। এই প্রশিক্ষণই মুসলমানদেরকে শিখিয়েছিল কীভাবে দুর্গম পর্বতমালাকে সুগম করে, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্ররাশিকে সাঁতরিয়ে, গহীন অরণ্যের পথ মাড়িয়ে পৃথিবীর দিক-প্রান্তে তাওহীদের বাণী পৌছাতে হয়। এই প্রশিক্ষণই মুসলমানদেরকে এক শাশ্বত ও সুমহান বার্তা শিখিয়েছিল যে, বিজীত এলাকাতে লুটপাট-ছিনতাই নয়, নয় কোন নির্যাতন বরং অনুপম আদর্শের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার কৌশল। সে জন্যই মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত ত্যাগকালে এদেশের মূর্তিপূজারীরা বিলাপ করেছিল, তার মূর্তি বানিয়ে পূজাও করেছিল বলে ইতিহাস লিখছে। (যদিও তিনি স্বহস্তে তা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং মূর্তিপূজার অসাড়তার কথা জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন)।

আল্লাহ তা'আলা নিজেও তার বান্দাদেরকে খাঁটি বান্দা হিসেবে তৈরি করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন- পাঁচওয়াক্ত সালাত ও অন্যান্য সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, ইত্যাদি। সালাতের মাধ্যমে একজন বান্দা নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহর সামনে বিলীন করার মহান শিক্ষা পায়, যা তাকে স্বৈরাচারী, অহংকারী হতে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করে থাকে। সালাত আমাদেরকে এই প্রশিক্ষণই প্রদান করে থাকে যে, যেহেতু একজন বান্দা তার আমিত্বকে, বড়ত্বকে অহমিকাকে এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত আল্লাহর সামনে বিলীন করে দেয় সেহেতু তার নিজস্ব মতকে সে প্রভু হিসেবে মানতে পারে না। সে কোনভাবেই মানবরচিত আইন মেনে নিতে পারে না, আল্লাহর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়ে কোন আইন রচনা করতে পারে না। কারণ সে আল্লাহর সামনে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করার জন্যই সালাতে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর সামনে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করার প্রাথমিক কাজ হলো আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইনকে দ্বিধাহীনচিত্তে, সংকোচহীনভাবে, প্রশান্তমনে মাথা পেতে মেনে নেয়া, সালাতের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার এই প্রাথমিক দাবিকে যদি কেউ মেনে নিতে না পারে সে আর যাই হোক আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে পারে না। আল্লাহর নিকটে তার সেই সালাতের গ্রহণযোগ্যতার আশা করা যায় না। এভাবে ইসলামের প্রত্যেকটি 'ইবাদতের অন্তর্নিহিত রূপ রয়েছে, যা অন্তর চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরাই অনুধাবন করতে পারে।

বিভিন্ন 'ইবাদতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের এই যে মহান ব্যবস্থা, তা তো এমনি এমনি নয়, বরং তা একজন মুসলিমকে বিশেষতঃ তাওহীদী আন্দোলনের একজন কর্মীকে খাঁটি, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী এমনকি আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত করারই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সামরিক প্রশিক্ষণের কথা তো আল্লাহ তা'আলা কুরআনেই বলেছেন:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾

"আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে।"[৭৯]

---

৭৯ সূরা আল আনফাল ৮ : ৬০।

জাতির পিতা ইব্‌রাহীম ('আলায়হিস্ সালাম) একটি আদর্শ জাতিসত্ত্বা গঠন করার লক্ষ্যেই নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করে বলেছিলেন:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের রব! আপনি তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা প্রদান করবেন এবং তাদেরকে দুরাচার হতে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৮০]

নবী ইব্‌রাহীম ('আলায়হিস্ সালাম)-এর দু'আর বরকতে সুদীর্ঘ সাড়ে তিন হাজার বছর পর এই ধূলির ধরায় আগমন করলেন নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। তিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনালেন, কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা প্রদান করলেন, সকল প্রকার শির্‌ক, কুফ্‌র, অনাচার, দুরাচার ও কলুষিত হৃদয় থেকে তাদেরকে পূত:পবিত্র পথ দেখালেন। ফলশ্রুতিতে, তারা পৃথিবীতে একটি আদর্শ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, অন্ধকার আরবে আলোর মশাল প্রজ্জ্বলিত করলো। আলোর সেই দ্যুতি জিনজিয়ান থেকে মরক্কো পর্যন্ত পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ ভূমিকে আলোকিত করে তুললো। অসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসকে মুছে ফেলে সভ্যতার দুয়ার উন্মোচন করল, এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই তাদেরকে দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, সংস্কৃতি আর জাতিভেদের সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এক মহাজাতিতে পরিণত করল। যে মহাজাতি তার জাতিসত্বাকে এক মহাশক্তিতে পরিণত করে চীনের জিনজিয়ান, মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে, ককেশাস আর বলকান অঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশে এবং আটলান্টিকের ওপাড়ে কিংবা আফ্রিকার গহীন অরণ্যে তাওহীদের বাণী এবং মানুষের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্তির পয়গাম পৌঁছে দিলো।

---

৮০ সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২৯।

এ হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফল। নবী (ﷺ) ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল একজন প্রশিক্ষক (Trainer), সংগঠক (Organizer) ও একটি আদর্শ কালজয়ী জাতির নির্মাতা (Founder)।

এ কথার সমর্থনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

"সেই মহান সত্তা নিরক্ষর (বর্বর) এক জাতির কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ (প্রশিক্ষিত) করবেন। সেইসাথে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখাবেন। যদিও ইতঃপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।"[৮১]

এ বর্বর ও অসভ্য জাতিকে ওহীর জ্ঞানে আলোকিত করে, ঈমানের সুদীপ্ত নূরে উদ্ভাসিত করে, ইবাদত ও মু'য়ামালাতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলো হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে এবং দীনের প্রচার-প্রসারে নিত্য-নতুন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বনের শিক্ষা দিয়ে নবী মুহাম্মদ স. একটি আদর্শ ও সুসভ্য শ্রেষ্ঠ জাতি বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। সুতরাং আদর্শ কর্মী গঠনে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ধাপে-ধাপে, ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য কর্মীদের মান বিবেচনায় সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে কোর্স-কারিকুলাম নির্ধারিত থাকা জরুরি। তবেই প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হবে এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

আমরা খেয়াল করলেই বুঝব যে, প্রশিক্ষণ ছাড়া ঘোড়াকে যুদ্ধের ময়দানে নামানো হয় না। কোন ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাকে প্রশিক্ষণ না দিয়ে সৈনিক বানানো হয় না, এমনকি কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে তার শিকারও খাওয়া যায় না।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে এই কিঞ্চিত আলোচনা আমাদের সকলকে প্রশিক্ষণ নিতে ও দিতে আগ্রহী করে তুলবে বলে আশা করছি।

---

[৮১] সূরা আল-জুম'আ, ৬২ : ০২

পঞ্চম দফা

ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার

(Reformation of the Society)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া সে বসবাস করতে পারে না। বাঁচতে পারে না। মানুষের সামষ্টিক রূপই হলো সমাজ। মানব সমাজ শুরু হয়েছিল দু'জন নর-নারী দ্বারা। এরপর তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে সামাজিক বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে, নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান আমরা যে সমাজ ব্যবস্থা দেখতে পাই বা আমরা যে সমাজে বসবাস করি তা মিশ্র সমাজ। এই সমাজে ভাল-মন্দ, ধনী-গরিব, শাষক-শোষিত, রাজা-প্রজা, সকলেই একত্রে বসবাস করে। অথচ তাদের মাঝে এক ধরনের অন্তরপর্দা বিরাজমান। সৃষ্টির সূচনালগ্নে সামাজিক জীবনপ্রবাহ আর এখনকার সামাজিক জীবন প্রবাহের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। তবে একথা খুব ভালভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমরা যে সমাজকে আদিম সমাজ বা বর্বর যুগ বলে অভিহিত করে থাকি তা মূলত বর্বর নয়, আদিম সমাজ বলতেও কিছু নেই। কারণ মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল সেদিন, যেদিন আদম ও হাওয়া ('আলায়হিমাস্ সালাম) পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এই অবস্থায় এসে পৌছেছে। এজন্য আমরা মানব সমাজের ইতিহাসে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে ধরনের একতা, নিয়ম-কানুনের কঠোরতা, সামাজিক বন্ধন বিরাজমান ছিল, তা এখনকার সমাজে নেই বললেই চলে। বর্তমানের সমাজ হলো ভঙ্গুর সমাজ। সেজন্যই এখনকার সমাজে আগের মতো ঐক্য নেই। সামাজিক নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা নেই, সম্মানবোধ নেই, শ্রদ্ধাবোধ নেই। আমরা এখানে ইতিহাস থেকে সামাজিক তিনটি ধারা বর্ণনা করব:

১. নবী (ﷺ)-এর আগমনের প্রাক্কালে আরব তথা গোটা বিশ্বের সামাজিক দুরাবস্থা।

২. সেই দুরাবস্থার তথা জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্নতা দূরীভূত করে রিসালাতের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত বিশ্বের সবচেয়ে শৃঙ্খলাপরায়ণ একটি জাতির সামাজিক চিত্র।

৩. সেই উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত সামাজিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আবারো তমসাচ্ছন্ন জাহিলিয়াতে ফিরে যাওয়া আর সেটাকেই আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, অগ্রসরতা হিসেবে প্রপাগাণ্ডা চালানো এবং সেই স্রোতে সাধারণ মানুষের গা ভাসিয়ে দেয়া। বর্তমানে আমরা এ ধারা অতিক্রম করছি। আফসোসের বিষয় হলো- সেই জাহেলিয়াতে ফিরে যাওয়ার জন্য মুসলমানের সন্তানেরা দাবি জানাচ্ছে, বক্তৃতা করছে, এমনকি গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণজাগরণ মঞ্চও তৈরী করছে।

সমাজের এই যে দুরাবস্থা, দূরাচারিতা তথা সামাজিক অবক্ষয় তা থেকে জাতি, সমাজ ও দেশকে পরিশুদ্ধ ও সংস্কার করাই শুব্বানের পঞ্চম ও সর্বশেষ কর্মসূচি।

আমরা ভাল করে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখব যে, আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়কার মানুষেরা শৌর্য-বীর্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। তাদের মাঝে বীরপুরুষ ও সংস্কৃতিমনা লোকের অভাব ছিল না। ভাল গুণের কিছু মানুষও ছিল। (যেমন- ১. দান-দক্ষিণায় তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হত। ২. সাহিত্যে তাদের এত উন্নতি ছিল যে, তাদের কবিতা আজকের যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সিলেবাসভুক্ত। ৩. তারা যুদ্ধ কৌশল জানত, তাদের অস্ত্র ছিল। ৪. অতিথিপরায়ণতায় তাদের জুড়ি ছিল না।) এতকিছুর পরও তাদের যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়াত নামে আখ্যায়িত করা হয় কেন? এর কারণ বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বেরিয়ে আসবে।

১. তাদের নিকট রিসালাতের জ্ঞান ছিল না। ফলে তারা জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল না।

২. তাদের নিকট জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ছিল না। এজন্য তারা নিজেদের জন্য নিজেরাই আইন রচনা করত।

৩. তারা যুদ্ধ করত নিজ গোত্রের জন্য। তাই তারা ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা করত না।

৪. তারা সংস্কৃতি চর্চা করত, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ছিল তাওহীদের জ্ঞানশূন্য। ফলে সে সংস্কৃতি ছিল অন্তসারশূন্য, কুসংস্কারসমৃদ্ধ, কুরুচিপূর্ণ, জীবনাদর্শ সেখানে অনুপস্থিত।

এবার আমরা একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে যা দেখতে পাই তা হলো:

১. এই সমাজের মানুষের নিকট রিসালাতের জ্ঞান বিদ্যমান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সে জ্ঞান থেকে দূরে। ফলে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, জীবনের জবাবদিহিতা, পরকালীন জীবনের জন্য ইহকালীন জীবনের জবাবদিহিতামূলক আচরণ সম্পর্কে অনেকেই অসচেতন। ফলে এ সমাজেও স্বৈরাচারিতা, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা হয়েছিল জাহেলী সমাজে।

২. এদের নিকট জীবন পরিচালনার রূপরেখা বিদ্যমান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা গ্রহণ করতে নারাজ। ফলে, এরাও নিজেদের জীবন, দেশ, সমাজ পরিচালনার জন্য নিজেরাই আইন রচনা করে চলছে। আমরা এও জানি যে, আইন রচিত হয় একটি বিশেষ শ্রেণির তত্ত্বাবধানে। ফলে সেখানে ঐ বিশেষ শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ হয়। সেই আইন সার্বজনীন হয় না। কল্যাণমুখী আইনের পরিবর্তে সেখানেও স্বেচ্ছাচারিতা স্থান লাভ করে। সেই আইন কখনও পূর্ণাঙ্গ হয় না। অপূর্ণাঙ্গই থেকে যায়। কারণ এক সৃষ্টি অপর আরেক সৃষ্টির জন্য কীভাবে আইন রচনা করতে পারে, অথচ তাদের জ্ঞান সীমিত। তা কেবল সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তিনিই পারেন।

৩. এই সমাজের লোকেরা যুদ্ধ করে নিজ দেশের জন্য, আপন জাতির জন্য। সুতরাং এখানেও ন্যায়-অন্যায়, বাছ-বিচার করা হয় না। যেমনটি করেছিল জাহেলী সমাজের লোকেরা, তারাও নিজ গোত্রের জন্য লড়াই করত।

৪. এ সমাজের লোকেরাও সংস্কৃতির চর্চা করে, যারা তাদের মতো করে সংস্কৃতি চর্চা করে না, তাদের নিন্দা করে। কিন্তু এদের সংস্কৃতিও

তাওহীদের জ্ঞানশূন্য, সেখানে কল্যাণমুখী জ্ঞানের প্রচুর অভাব। ফলে এই সংস্কৃতিমনা লোকেরা নাস্তিক হয়, ধর্মের তো নয়ই বরং অধর্মের চর্চা করে, এরা জংলী পশুর মতো চুল, দাড়ি, গোঁফ রাখে, গাঁজা খায়, মদ খায়, অশ্লীলতা, বেহায়াপনার আশ্রয় দেয়, মদদ দেয়, এরা বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবাধ-অবৈধ মেলামেশার পক্ষে প্রচারণা চালায়, যৌনতাকে উস্কে দেয়, যেমনটি করেছিল জাহেলী যুগের কবি সাহিত্যিকরা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয় যে, একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্য সমাজের (!) ধ্বজাধারীরা সেই পুরাতন জাহেলিয়াতকেই আঁকড়ে ধরে আছে। বরং সেই জাহেলিয়াতকেই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করে চলছে।

ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলিয়াতের যে বীজ বপন হয়েছে, হচ্ছে সেই বীজ উপড়ে ফেলে তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনকে রিসালাতের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার করা। এই সংস্কারের পদ্ধতি কী, তা আমাদের কর্মপদ্ধতিতে উল্লেখ করা আছে। কর্মী ভাইয়েরা ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য কী, তা ভাল করে অনুধাবন করে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো জেনে নিয়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করলে সমাজ, দেশ, জাতি অকৃত্রিম উপকার লাভ করবে। ইনশা-আল্লাহ!

এবার আমরা তাদের কথায় আসি, যারা সমাজ সংস্কারের নামে সমাজে বিভক্তি, দলীয়করণ এমনকি মারামারি পর্যন্ত করতে পিছপা হচ্ছে না। এই সংস্কারপন্থী লোকেরা দুই ধরনের। প্রথম প্রকার হলো— যারা জাতিশুদ্ধিকরণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন পরিষদ, নানান ধরনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, বুদ্ধিজীবি মহলের বুদ্ধির ছড়াছড়ি, পত্র-পত্রিকায় সরগরম, সাহিত্যিক ও কাব্যিক আকারের লেখালেখি এমনকি শুদ্ধি অভিযান পরিচালিত হয়। জাতীয় বিভক্তির সীমারেখা তাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বস্তুত, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পরিবর্তে বিভক্ত করা আল্লাহর দুশমন ফিরআউনের

গৃহীত নীতি। আল্লাহ সেই নীতির সমালোচনা করে এবং মু'মিনদের সতর্ক করে বলেন:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

"নিশ্চয়ই ফিরআউন জমিনে ক্ষমতাধর হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে হীনবল করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"[৮২]

একথা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে, নিছক ক্ষমতার লোভেই ফিরআউন বনী ইসরা-ঈলের সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যদিও তার শেষ রক্ষা হয়নি। ঠিক একই নীতি গ্রহণ করেছিল (এবং এখনও তা বলবৎ) ব্রিটিশরা। আর তা হলো "Divide and Rule" তথা "ভাগ করো শাসন করো"। এই নীতিই আজকে আমেরিকা থেকে আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাত করা হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে। ইসলামপন্থী ও নন-ইসলামপন্থীর যে অভিশপ্ত বিভক্তি তা মূলত তাদের কারখানাতেই আবিষ্কৃত। আর এই অভিশপ্ত নীতিকেই নিজের জীবনের অন্যতম লক্ষবস্তু বানিয়ে জাতীয় বিভক্তি পরিচালিত হচ্ছে এক শ্রেণির ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের দ্বারা। সমাজ ব্যবস্থার এই কালোরূপ সংস্কার না হলে জাতীয় শান্তি, নিরাপত্তা, ঐক্য এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা হবে না।

স্বৈরতান্ত্রিক এই মূলনীতির মূলে কুঠারাঘাত করেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। ৮ম হিজরীতে সংঘঠিত ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিনে ক্ষমা আর মহানুভবতার বিশ্ববিশ্রুত কাব্যগাঁথা ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। জাতিভেদের বীজ বপনকারী আজকের স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা যদি তা অনুধাবন করত তাহলে কতই না কল্যাণ হত।

সংস্কার পন্থীদের দ্বিতীয় দলের শীর্ষে রয়েছে তারা, যারা ধর্মীয় গোঁড়ামীতে লিপ্ত। মুসলিম জাতির বৃহৎ ঐক্য কামনা না করে তাদের মাঝে

---

[৮২]. *সূরা আল ক্বাসাস ২৮ : ৪।*

মাযহাবী গোঁড়ামী, বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ ও গোত্রপ্রীতি প্রবলভাবে জয়ী হয়েছে। এ বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত মুসলিম জাতির বৃহৎ কল্যাণ কামনা করে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) যে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন ("মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়"), তা আজ প্রত্যেক মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি। শুব্বানের প্রত্যেক কর্মীকে সেই বই-এর নীতিমালা অবলম্বন করার বিশেষ অনুরোধ করছি।

যারা ধর্মীয় বিষয়ে শরীয়তের উৎসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করে 'আমল করতে চান তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। শুব্বানেরও সেই আদর্শ বটে। তবে তাদের মাঝেও এক শ্রেণির লোকের বাড়াবাড়িতে বৃহৎ কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

তাদের সম্বল হলো গুটিকতক মাসআলা। যেগুলোর বাহ্যিক রূপ জনগণের সামনে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। যেমন- মসজিদে মিহরাব হবে কিনা! জুমু'আর সালাতে দুই আযান না কি এক আযান ইত্যাদি। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা এমন সব নিত্য-নতুন মাসআলা উদ্ভাবন করে চলেছেন যেগুলো সাহাবীদের যুগেও মীমাংসিত ছিল, যেগুলো নিয়ে মতানৈক্যের অনুমতি শরীয়তে নেই। যেমন- শরীকানায় কুরবানী করা না করা। আমাদের জানা দরকার যে, এই সমস্ত মাসআলা নিয়ে মতানৈক্য করাই অবৈধ। আবার কেউ বিশ্ব মুসলিমের নিদর্শন স্বরূপ সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করার রেওয়াজ চালু করতে গিয়ে ঈদের দিন হাতাহাতি পর্যন্ত করেছে। ঈদের আনন্দ বিলীন হচ্ছে তাদের মাসআলার কাছে। এ দেশের সব আহ্‌লে হাদীসরা আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর রেফারেন্স দেন, তাকে আদর্শ সংগঠক হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেন না, করলেও কিন্তু নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য এহেন অসদুপায় অবলম্বন করেন, সেই আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) সাহেব এ দেশে কী

করেছেন তা কি তারা জানেন? তিনি তো শেষ জীবনে এই কাজই করেছেন যে, কীভাবে এ দেশের আহ্লে হাদীস সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।

এজন্য তার মতো উপমহাদেশের ইসলামী রাজনীতির পুরোধা ব্যক্তিত্বও শেষ জীবনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। যে গ্রামে একাধিক ঈদের জামা'আত হত তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেই গ্রামের মানুষেরা এক ইমামের পিছনে একটিই ঈদগাহ নির্মাণ করেছেন। তিনি মাসজিদে রাত কাটিয়েছেন, ঈদের দিনেও "ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহর" দা'ওয়াত দিতে গিয়ে ডাল-ভাত দিয়ে পার করেছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে, মসজিদে মসজিদে ঘুরে, সারা দেশে সফর করে, অবিরাম পরিশ্রমের পর যিনি এ দেশের আহ্লে হাদীস সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করলেন সেই আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ঐক্যবদ্ধ সমাজকে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দ্বিধাবিভক্ত করল তথাকথিত সমাজ সংস্কারক সহীহ হাদীসের অনুসারীরা "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"!

তাদের সব মাসআলা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না ঐক্যের কথা, একতার কথা। এটা সমাজ সংস্কার নয়, এটা সমাজ ধ্বংস করার এক ঘৃণিত পরিকল্পনা। এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, মাসায়েল নিয়ে সাহাবীদের মাঝেও মতানৈক্য ছিল, কিন্তু কেউ তো নিজ মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা কোন দল করেননি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) তার অমর গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" প্রথম খণ্ডে এ. বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। সবাইকে তা পড়ে নেয়ার অনুরোধ করছি। আশা করি, আমি আমার কর্মী ভাইদের নিকটে সমাজ সংস্কার বলতে কী বুঝায় আর সমাজ সংস্কারের নামে কী হচ্ছে তা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করে তার দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করার তাওফিক্ব দান করুন। আমীন!

ইতিকথা

শুব্বানের পাঁচদফার উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় ইসলামের মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা ও মানা সকল মুসলিমের বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীর জন্য আবশ্যক। আমি একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই কর্মসূচিতে ইসলামের প্রকৃত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। আমি এও বিশ্বাস করি যে, ইসলামের আদর্শই আমাদের প্রকৃত আদর্শ। এ দেশের প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উত্তম ব্যবস্থা এর থেকে আর নেই। আর প্রত্যেকটি শুব্বান কর্মীর এই বিশ্বাস থাকা উচিৎ যে, আমরা অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছি। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য আমাদের জন্য অবধারিত। ইন্‌শা-আল্লাহ!

"حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير". نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.

وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

তানযীল আহমদ
জমাদিউস সানী, ১৪৩৯ হিজরী
নীলফামারী।

শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচি :

- ইসলাহুল 'আক্বীদাহ বা 'আক্বীদাহ সংশোধন
- আদ-দা'ওয়াহ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার
- আত-তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা
- আত-তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ
- ইসলাহুল মুজতামা' বা সমাজ সংস্কার

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, মোবাইল: ০১৭৬৫ ৮১২২৬১
info.shubbanbd@gmail.com, www.shubbanbd.org